

এটাই আমার পথ

هَذِهِ سَبِيلِي

শেখ ওমর রাসেল

শেখ ওমর রাসেল

এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

E-mail: etaiamarpath@gmail.com

প্রথম সংস্করণ

রবিউল আউয়্যাল ১৪৩১

ফেব্রুয়ারি ২০১০

পরিত্র কুরআনের অনুবাদ

কুরআন শুধুমাত্র তার নিজস্ব মূল আরবী ভাষাতেই যথাযথ ভাব ও অর্থ প্রকাশ করে।
তাই এটা বোকা প্রয়োজন যে, কুরআনের যথাযথ ভাষার অসম্ভব। বাংলা ভাষাভাষীরা
যাতে কুরআনের বক্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন তাই এ দেশের সম্মানিত
আলিমগণের অনেকেই কুরআনের ভাবানুবাদ করেছেন। আমরা এই বইয়ে বাংলাদেশে
প্রচলিত ভাবানুবাদ গ্রন্থগুলোর সাহায্য গ্রহণ করেছি।

প্রথম সংস্করণে কোনো ভুল-ক্রটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে দয়া করে আমাদেরকে
জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নিতে চেষ্টা করব। কুরআনের আয়াতের
অর্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে অক্ষরগুলোকে বোল্ড করে দেয়া আছে। হাদীসের অর্থের
অনুবাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইংরেজি করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী

সা - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রা - রাদিয়াল্লাহু আনহু

রহ - রহমতুল্লাহি আলাইহি

قُلْ هَذِهِ سَبِيلٌي أَدْعُو إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ

بَصِيرَةٌ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

“বলঃ এটাই আমার পথ, আমি আল্লাহর
দিকে সজ্ঞানে মানুষকে আহ্বান করি এবং
আমার অনুসারীরাও...।”

[সূরা ইউসুফ: ১০৮]

হে আল্লাহ,

বাংলাদেশে রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীদের পথে জনগণকে আহ্বান করতে গিয়ে
জালিম শাসকগোষ্ঠীর হাতে যারা কারাগারে ও কারাগারের বাইরে নির্যাতিত হয়েছে,
তাদেরকে তুমি সবসময় তোমার হেদায়েত ও রহমতের চাদরে ঢেকে রেখ এবং
আমাদের সবাইকে সেই পথের উপর দৃঢ় রেখ যেন আমরা এই জনপদে তোমার
খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

বিষয়বস্তু

ভূমিকা

১. খিলাফত	৮
২. ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার অপরিহার্যতা	১১
৩. কুফরী দলকে সমর্থন করার পরিণাম	১৭
৪. খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি	১৮
৪.১ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর	১৮
৪.২ সঠিক পদ্ধতি	২০
৫. ‘এটাই আমার পথ’	২৫
৫.১ দল গঠন	২৫
৫.২ সমাজ পরিবর্তনের পকাশ্য আন্দোলন	২৫
৫.৩ প্রভাবশালীদের সমর্থনে শাসনকর্তৃত্ব অর্জন	২৬
৬. ইসলাম প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত ভুল পদ্ধতি ও চিন্সমূহ	২৭
৬.১ রাজনীতিবিবর্জিত দাওয়াত	২৭
৬.২ সশন্ত্র সংগ্রাম	২৯
৬.২.১ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগের ও পরের পদ্ধতি	৩৩
৬.৩ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি	৩৩
৬.৩.১ নির্বাচন ও গণতন্ত্র এক কথা নয়	৩৬
৬.৩.২ সংসদ (Parliament) ও মজলিসে শুরা এক বিষয় নয়	৩৭
৬.৪ Secularism/ ধর্মনিরপেক্ষতা	৩৮
৬.৫ জাতীয়তাবাদ	৩৯
৬.৬ নারী নেতৃত্ব	৪০
৬.৭ জরুরত	৪১
৬.৮ হৃদায়বিয়ার সংস্কৃতি	৪৩
৬.৯ মন্দের ভালো	৪৪
৬.১০ নিয়ত	৪৫
৬.১১ অন্঱ের ঘৃণাই যথেষ্ট	৪৬
৬.১২ হিকমত	৪৬
৬.১৩ তিহাতৰ ফিরকা	৪৯
৬.১৪ মধ্যমপন্থা ও সমরোতা	৫৪
৬.১৫ ইমাম মাহদীকে নিয়ে বিভাস্তি	৬০
৭. জিহাদ নিয়ে বিভাস্তি	৬২
৮. পরবর্তী খিলাফত প্রতিষ্ঠা	৭৩

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

একটি অনুন্ত ও অধঃপতিত জাতিকে কীভাবে উন্নত ও পুনর্জাগরিত করানো যায়, সে বিষয়ে অনেকের বিশ্লেষণের মধ্যেই চিন্মার দীনতা পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি দেশ উন্নত বা পুনর্জাগরিত হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কাতার, কুয়েত বা সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি দেশের অর্থনীতি বা মাথাপিছু আয় আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও চীনের মতো শক্তিশালী দেশগুলো থেকে বেশি হলেও জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে কাতার, কুয়েত বা সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে উন্নত বা পুনর্জাগরিত দেশ হিসেবে গণ্য হয় না – তারা বড়জোর ‘ধনী’ দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও চীন এই দেশগুলো উন্নত বা পুনর্জাগরিত হিসেবে সকলের কাছে স্বীকৃত।

এর কারণ হলো প্রকৃতপক্ষে উন্নতি বলতে কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে বোঝায় না। সঠিক উন্নতি বা পুনর্জাগরণ বলতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক উন্নয়নকে বোঝায়। কোনো জাতি যখন মানুষ, জীবন ও মহাবিশ্ব সম্বন্ধে স্বচ্ছ চিন্মার ধারণ করে, এই জীবনের আগে কী ছিল ও এই জীবনের পরে কী হবে – এসব বিষয়ে সামগ্রিকভাবে সঠিক চিন্মার সন্দান পায়, তখন সে জাতি অধঃপতিত অবস্থা থেকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজে পায়। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দীন, আদর্শিকভাবে হীন একটি জাতির সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন কখনোই হয় না:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعِيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। [সূরা রাদ: ১১]

মানুষ, জীবন ও মহাবিশ্ব সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা প্রদানকারী কোনো মতাদর্শ (Ideology)^১-কে আঁকড়ে না ধরলে কোনো জাতি প্রকৃত অর্থে উন্নত হতে পারবে না। তবে ভুল মতাদর্শ (Ideology) বেছে নিলে এই উন্নতি এক ধরনের ভুল উন্নতি হিসেবে চিহ্নিত হবে। যেমন: আমেরিকা, ইউরোপ বা চীনের মতো দেশগুলো অবশ্যই উন্নত, তবে এই উন্নতি হলো ভুল উন্নতি। কেননা এদের মতাদর্শ হলো পুঁজিবাদ (বা

১. মতাদর্শ (Ideology) হচ্ছে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাস যা থেকে একটি জীবন ব্যবস্থা বিকশিত হয়। যেমন পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম।

চীনের ক্ষেত্রে, পুঁজিবাদমিশ্রিত সমাজতন্ত্র)। ইউরোপ-আমেরিকার জাতি-রাষ্ট্রসমূহ ওই পুঁজিবাদকে তাদের মানুষ, জীবন ও মহাবিশ্বসংক্রান্ত যাবতীয় চিন্মাত্র ভিত্তি হিসেবে নিয়েছে, জীবন ও রাষ্ট্রের সকল সমস্যা সেই ঐক্যবদ্ধ চিন্মাত্র ভিত্তিতে সমাধান করে। এরূপ মতাদর্শভিত্তিক বুদ্ধিগৃহিতের চিন্মাত্র কারণে একটি পর্যায় পর্যন্ত তারা সাফল্য পায় – যেমনটা তারা ইতিমধ্যে অর্জনও করেছে। কিন্তু মানবরচিত এসব মতাদর্শের ভ্রান্তির কারণে ওই উন্নতি আসলে সঠিক বা স্থায়ী উন্নতি নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯১৭ কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রভৃতি উন্নতি অর্জন করেছিল, কিন্তু মতাদর্শের দুর্বলতার কারণে তা ১৯৯১ সালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একইভাবে, বর্তমানে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে – যেমনটা সোভিয়েত রাষ্ট্রে শোনা গিয়েছিল ১৯৮০-এর দশকে।

কারো কারো মনে অঙ্গুত ধারণা আছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির কারণে ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে, মতাদর্শ হিসেবে পুঁজিবাদের বিকাশের আগে ইউরোপ-আমেরিকা ছিল অজ্ঞানতা ও পশ্চাত্পদতার অন্ধকার নির্দর্শন। পুঁজিবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর ইউরোপ-আমেরিকার মতাদর্শিক রাষ্ট্রগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করেছে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি কোনো জাতির জেগে ওঠার মাধ্যম নয় – বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো কোনো জাতির বুদ্ধিগৃহিতভাবে জেগে ওঠার ফলাফল।

কেউ কেউ মনে করে, বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অনুকরণে আইন ও রাষ্ট্রকাঠামো সাজিয়ে নিলে ওই উন্নত রাষ্ট্রের সমকক্ষতা অর্জন করা যাবে তথা উন্নতি লাভ করা যাবে। কিন্তু অন্য দেশ থেকে আইন বা ব্যবস্থা আমদানি করে যে উন্নতি লাভ করা যায় না, বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের সবদেশই এর অনস্বীকার্য প্রমাণ। বাংলাদেশসহ এই দেশগুলো সংবিধান, রাষ্ট্রকাঠামো, আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা সবই ইউরোপ-আমেরিকা থেকে (স্বেচ্ছায় কিংবা চাপে পড়ে) নকল করেছে। এমন কি, এখনো এসব দেশের সরকারগুলো বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা তথাকথিত দাতাদেশগুলো থেকে অহরহ নীতি, উপদেশ ধার করে যাচ্ছে। মুক্ত বাজার, গ্লোবালাইজেশন, গুড গভর্নেন্স – যখন যেটা পাচ্ছে চোখ বুঁজে নিয়ে নিচ্ছে। তবু উন্নতি অধরাই থেকে যায়।

এর কারণ হলো, ইউরোপ-আমেরিকার জাতি-রাষ্ট্রগুলো ওইসব আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাদের নিজস্ব মতাদর্শিক চিন্মাত্র-চেতনা ও বিশ্বাস থেকে। আর বাংলাদেশের মতো দেশগুলো মতাদর্শিক চিন্মাত্র-চেতনা ও বিশ্বাসকে পাশ কাটিয়ে কেবল ভূত্যের মতো আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে উন্নতি খুঁজছে। মূলত কোনো আইন বা ব্যবস্থাকে যদি মতাদর্শের ভিত্তিতে নেয়া হয় তাহলে এক ধরনের ফলাফল হয়; আবার যদি মতাদর্শকে না বুঝে, বুদ্ধিগৃহিতের দীনতার মধ্যে থেকে ওই একই আইন বা

ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে আরেক ধরনের ফলাফল হয়। ইতিহাস একথার স্বচ্ছ সাক্ষী। ১৯২৪ সাল থেকে মুস্তফা কামাল পাশা তুরক্ষের সর্বত্র তৎকালীন বিশ্বের সুপারপাওয়ার বৃটেনের অনুকরণে আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা চালু করেছিল। এর মাধ্যমে কামাল পাশা বৃটেনের মতো উন্নত হওয়ার স্পন্দন দেখাতো। কিন্তু ফলাফল হলো, ১৯২৪ সালের পরের তুরক্ষ ১৯২৪ সালের আগের তুরক্ষের চেয়েও পিছিয়ে যায়। কারণ বৃটিশরা ওই সমস্ত আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা তাদের মতাদর্শ (ideology) পুঁজিবাদের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিল। আর তুর্কিরা মতাদর্শ না বুঝে শুধু অন্ধ অনুকরণই করেছিল। অথচ ওই একই সময়ে মতাদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন লেলিন-স্ট্যালিনের হাত ধরে উন্নতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। কামাল পাশার মতো করে তৃতীয় বিশ্বের সবদেশের স্বাধীনতার স্থপতিরা পশ্চিমা দেশগুলোর আইন ও ব্যবস্থাকে অনুকরণ করতে গিয়ে কেবল ব্যর্থই হয়েছে।

সঠিক মতাদর্শিক চিনার ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবন্ধ করে ও সেই চিনা থেকে উদ্ভূত আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থাকে জীবন ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে বাস্বায়ন করে কীভাবে একটি জাতিকে উন্নত করা যায়, সেটার উজ্জ্বলতম উদাহরণ হলেন মহানবী মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহর কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হওয়ার পর রাসূল (সা) আরবের মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস তথা সঠিক মতাদর্শিক চিনার দিকে আহবান করেছিলেন। ৬২২ সালে তিনি মদীনার বিবাদমান দুই গোত্র আউস ও খাজরায়কে ইসলামী চিনার ভিত্তিতে একত্রিত করে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, সেটি পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে বিশ্বকে সভ্যতা-উন্নতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান সবকিছুর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে খিলাফতে রাশেদা, উমাইয়া খিলাফত, আবুসৌয় খিলাফত ও উসমানীয় খিলাফতের মহান খলীফাদের নেতৃত্বে ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র ইসলামী মতাদর্শের ধারক-বাহক হিসেবে মাথা উঁচু করে বিশ্বে ঢিকে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ঘড়্যন্ত, মুস্ফা কামাল পাশাদের মতো বিশ্বাসঘাতকদের দালালি ও শেষদিককার খলীফাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে ইসলামী মতাদর্শ থেকে খিলাফত রাষ্ট্র ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ বিশ্বাসঘাতক মুস্ফা কামালের হাতে খিলাফত রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে।

তাই পুনরায় জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদেরকে ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবন্ধ করতে হবে এবং সেই ঐক্যবন্ধ জনগণের শক্তিতে ইসলামী আইন ও বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োগকারী খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১. খিলাফত

যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আহকামে শরীয়াহর প্রয়োগ ও ইসলাম প্রচারের জন্য দায়িত্বশীল তাই হচ্ছে খিলাফত। ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকেই খিলাফত নামে অভিহিত করা হয়। ইমামত বলতেও একই ব্যবস্থাকেই বোঝায়। খিলাফতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) বলেন:

هِيَ الرِّئَاسَةُ الْعَمَّةُ فِي التَّصْدِي لِإِقَامَةِ الدِّينِ

‘খিলাফত হচ্ছে এমন এক সাধারণ রাষ্ট্র যা দ্বীন বাস্তুবায়ন করার প্রতি মনোযোগী থাকে।’ [ইয়ালাতুল খীফা আন খিলাফাতল খুলাফা, লাহোর, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ২]

আল মাওয়াদী (রহ) বলেন:

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

‘ইমামত গঠিত হয় নবৃয়তের প্রতিনিধিত্ব, দ্বীন ইসলামের হিফাজত ও দুনিয়ার শাসনের জন্য।’ [আল-আহকামুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ১]

ইবনে খালদন (রহ)-এর মতে,

أَنَّ حَقِيقَةَ الْخِلَافَةِ نِيَابَةً عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي حِفْظِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

খিলাফতের বাস্তুবতা হলো আইনপ্রণয়নের অধিকারী [আল্লাহ]-র প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দ্বীনের রক্ষা ও পৃথিবীর শাসন। [আল মুকাদ্দিমাহ]

শায়খ তাকিউদ্দিন আন-নাবাহানী (রহ) বলেন,

الْخِلَافَةُ هِيَ رِئَاسَةُ عَامَّةٍ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي الدُّنْيَا لِإِقَامَةِ أَحْكَمِ الشَّرْعِ الإِسْلَامِيِّ،
وَحِمْلِ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ

খিলাফত হলো পৃথিবীর সকল মুসলিমের জন্য সাধারণ নেতৃত্ব। এর দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের আইন বাস্তুবায়ন করা ও সারা বিশ্বের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেঁচে দেয়া। [আল খিলাফাহ]

সারা বিশ্বের সমস্য মুসলমানের উপর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সমষ্টিগতভাবে মুসলমানদের এই দায়িত্বের প্রতি উদাসীন থাকা কিংবা একে

উপেক্ষা করা কবীরা গুনাহ যা আল্লাহর কিতাব, রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ, সাহাবা (রা)-দের ইজমা ও শ্রেষ্ঠ আলেমদের বক্তব্যে সুস্পষ্ট।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেন,

فَإِنْ كُمْ بَيْنَهُمْ إِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ مِّنْ أَحْقَقٌ

আর আপনি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। [সূরা আল মায়িদা: ৪৮]

وَإِنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

আর আপনি আলাহু যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফয়সালা করুন, আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; যেন তারা আপনার নিকট আলাহুর প্রেরিত কোনো বিধান থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে। [সূরা আল মায়িদা : ৪৯]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ যা নায়িল করেছেন তা অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না, তারাই তো কাফের। [সূরা আল মায়িদা: ৪৪]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

আলাহু যা নায়িল করেছেন তা অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না, তারাই তো জালিম। [সূরা আল মায়িদা: ৪৫]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

আলাহু যা নায়িল করেছেন তা অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না, তারাই তো ফাসেক। [সূরা আল মায়িদা: ৪৭]

উপরিউক্ত আয়াতগুলোসহ আরো বহু আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহর আইন বাস্ব বায়নের আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট আদেশ করেছেন যে, সমাজে মানুষের সমস্য বিষয়াদি যেন তাঁর নায়িলকৃত বিধানমতো পরিচালনা করা হয় এবং এটা করতে হলে নিশ্চিতভাবেই একজন শাসক বা খলীফা থাকতে হবে যিনি এটার বাস্ব প্রয়োগ করবেন। ইসলামী শাসক তথা খলীফা ছাড়া ইসলামী বিধিবিধান বাস্বায়ন সম্ভব নয়। যেহেতু আল্লাহর আদেশ অনুসারে সমাজে ইসলামী বিধিবিধান বাস্বায়ন একটি ফরয বিষয়, অতএব খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং খলীফা থাকাও একটি ফরয বিষয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ
بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি তার হাত (খলীফার) আনুগত্য হতে সরিয়ে নেবে সে আল্লাহর সাথে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় দেখা করবে যে তার কাছে কোনো প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে তার কাঁধে (কোনো খলীফার) বায'আত (আনুগত্যের শপথ) নেই তবে তার মৃত্যু হচ্ছে জাহিলিয়াতের (যুগের) মৃত্যু। [মুসলিম]

ইমাম আহমদ (রহ) বর্ণনা করেন,

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ইমাম (খলীফা) ব্যতিত মারা গেল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوُسُهُمُ الْأَنْبِياءُ كُلُّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدِهِ
وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوَا بَيْعَةُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখনই এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তার স্থলে অন্য নবী আসতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই। শীঘ্রই খলীফারা আসবেন এবং তারা সংখ্যায় হবেন অনেক। তাদের বাই'আত পরিপূর্ণ কর (একের পর

এক) প্রথম জন অতঃপর পরের জন এবং তাদের হক পরিপূর্ণ কর। নিচয়ই আল্লাহ তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। [বুখারী, মুসলিম]

প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে খলীফাবিহীন অবস্থায় মৃত্যুকে জাহেল যুগের মৃত্যু হিসেবে উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, খিলাফত একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এবং তৃতীয় হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী না আসায় কার তত্ত্বাবধানে মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে, সেটা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে খিলাফত ব্যবস্থা ও খলীফার তত্ত্বাবধান। কাজেই একজন খলীফার উপস্থিতি ফরয।

ইজমা আস্-সাহাবা

সাহাবীরা (রা) এই বিষয়টির গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝাতেন। তাই তাদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁরা তাঁর দাফনকাজকে বিলম্বিত করে আগে খলীফা নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। হ্যরত উমর (রা) তাঁর মৃত্যুর সময় পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার জন্য ছয়জনের প্যানেল গঠন করেছেন। এই ছয়জনের ভেতর উসমান (রা), আলী বিন আবু তালিব (রা) ও আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) ছিলেন। এই ছয়জন সাধারণ ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন রাসূল (সা)-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবী (রা)-দের ছয়জন – যাঁরা পৃথিবীতে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। উমর (রা) তখন আদেশ জারি করেছিলেন যে, তিনদিনের ভেতর খলীফা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যদি মতেক্ষে পৌছানো না যায়, তবে যে মতভেদ করতে থাকবে তাকে হত্যা করতে হবে। যদিও যথাযথ কারণ ছাড়া যে কোনো হত্যাকাণ্ড হারাম, তবু উমর (রা)-এর এই আদেশের বিরোধিতা সাহাবীরা (রা) কেউ করেননি। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় সাহাবীরা (রা) খলীফা ও খিলাফত ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যমান থাকাটা কতটা গুরুত্বের সাথে বুঝেছিলেন। খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে সাহাবীদের ঐকমত্য (ইজমা আস্-সাহাবা) একটা সুস্পষ্ট ও দৃঢ় প্রমাণ যে, খলীফা নিয়োগ করা ফরয।

ইমাম আল হাইসামী (রহ) বলেন, নবুয়ত যুগের সমান্তরি পর খলীফা নির্বাচন করা একটি বাধ্যবাধকতা - এ ব্যাপারে সাহাবীরা একমত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অন্য দায়িত্বগুলোর চেয়ে এটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন যখন তারা রাসূল (সা)-এর দাফন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। [সাওয়াইক আল হারাকাহ, পৃষ্ঠা ১৭]

ইমাম তাফতাজানী (রহ) বলেন, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে ইমাম নিয়োগ দেয়া বাধ্যতামূলক। উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর মৃত্যুর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব – এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সাহাবীরা এটাকে তাঁর দাফনের

চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন। [শরহে আল আকাইদ আল নাসাফিয়া, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩]

সাহাবী (রা)-দের এই ইজমা থেকে বোৰা যায়, খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজের প্রতি উদাসীনতা দেখানো রাসুল (সা)-এর দাফনকাজের প্রতি উদাসীনতা করার শামিল।

একইভাবে বিভিন্ন যুগের ইসলামী বিশেষজ্ঞগণও বিভিন্নভাবে খিলাফতের অযোজনীয়তার কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

আবু বকর (রা) বলেন, মুসলিদের জন্য দুইজন (একের অধিক) আমীর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, কারণ এতে তাদের কার্যাবলী ও চিন্তাতে মতভিন্নতা দেখা দিবে, তাদের এক বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়বে। তখন সুন্নত পরিত্যক্ত হবে, বিদআত ছড়িয়ে পড়বে এবং ফিতনা বেড়ে চলবে... [সীরাতে ইবন ইসহাক]

হ্যরত উমর (রা) বলেন,

وَاللَّهِ مَا يَزِعُ اللَّهُ بِسُلْطَانٍ أَعْظَمُ مِمَّا يَزِعُ بِالْقُرْآنِ

“আল্লাহর শপথ! কুরআন দিয়ে আল্লাহ যতটুকু রক্ষা ও প্রতিহত করেন, রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তার চেয়েও বেশি রক্ষা ও প্রতিহত করেন।” [কানজুল উম্মাল, হাদীস নং: ১৪২৮৪, তারিখে ইমাম আল-খাত্বাবি]

হ্যরত উসমান (রা) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ শাসনক্ষমতা দিয়ে যা করেন, কুরআন দিয়েও তা করেন না।” [মাজমু' ফতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩]

হ্যরত আলী (রা) বলেন,

لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَمِيرٌ بْرَأْ فَاجِرٌ

“একজন আমীর (খলীফা) ছাড়া জনগণ কখনোই পরিশুদ্ধ হবে না - (সেই আমীর) ভালো বা মন্দ (যা-ই হোক না কেন)।” [কানজুল উম্মাল/১৪২৮৬, বায়হাকী/৭৫০৮]

ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন,

وَأَنَّهَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ

“এবং এটা (খিলাফত) হচ্ছে দ্বীনের স্থানসমূহের মধ্যে একটি স্তু (যার উপর অন্য সব স্তু দাঁড়িয়ে থাকে)।” [তাফসীরে কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৪]

ইমাম ইবন হাযম (রহ) বলেন,

اتفقَ جمِيع أَهْل السَّنَة وَجَمِيع الْمُرْجِيَّة وَجَمِيع الشِّيَعَة وَجَمِيع الْخَوَارِج عَلَى وُجُوبِ الْإِمَامَة
আহলুস সুন্নাহর সবাই, মুরজিয়াদের সবাই, শিয়াদের সবাই, খারিজীদের সবাই
ইমামতের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে একমত হয়েছেন। [আল ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল
আহওয়ায়ী ওয়ান নাহল]

ইমাম গাযালী (রহ) খিলাফত হারানোর সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে বলেছিলেন,

القَضَا مَعْزُولُونَ وَالْوَلَايَات بَاطِلَة... وَجَمِيع تَصْرِفَاتِ الْوَلَاة فِي أَفْطَارِ الْعَالَمِ غَيْر نَافِذَة،
وَإِنَّمَا الْخَلْق كُلُّهُمْ مَقْدُومُونَ عَلَى الْحَرَامِ

“বিচারকরা বরখাস্ত হয়ে যাবে, প্রদেশগুলো অবৈধ হয়ে যাবে, ... কর্তৃত্বশীলদের
নির্দেশগুলো বাস্বায়ন হবে না এবং সমগ্র সৃষ্টি হারামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।” [আল
ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, পৃষ্ঠা ২৪০]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন:

أَنْ وَلَايَةُ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ بَلْ لَا قِيَامٌ لِلَّدِينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إِلَّا بِهَا

“জনগণের শাসক (খলীফা) নিয়োগ দেয়া দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ফরযগুলোর অন্যতম।
প্রকৃতপক্ষে এটি ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে না।” [সিয়াসা শরীয়াহ]

ইবনে খালদুন (রহ) বলেন,

الْخِلَافَةُ وَالْإِمَامَةُ لِمَمَا كَانَتْ حَقِيقَةُ الْمُلْكِ أَنَّهُ الْإِجْتِمَاعُ الضروري لِلْبَشَرِ

“খিলাফত ও ইমামত হলো বাস্তব রাষ্ট্র যা জনসাধারণের জন্য জরুরী।” [আল
মুকাদ্দিমাহ]

ইমাম আল মাওয়াদী (রহ) বলেন,

وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُولُ هَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

“(ইমামতের নেতৃত্ব)-এর সাথে (আনুগত্যের) চুক্তি করা উম্মতের জন্য ইজমা দ্বারা ফরয়।” [আল-আহকামুস সুলতানিয়া]

ইমাম নবী (রহ) বলেছেন,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَحِبُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبَ خَلِيفَةٍ

“(ইসলামী বিশেষজ্ঞদের) এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একজন খলীফা নির্বাচন করা মুসলমানদের উপর ফরয বিষয়।” [শরহে সহীহ মুসলিম]

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাম্মদ দেহলভী (রহ) বলেন, “খিলাফতের শর্তাবলী বিদ্যমান এমন শাসক নিয়োগ করা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের ওপর ফরয-ই-কিফায়া।” [ইয়ালাতুল খীফা আন খিলাফাতিল খুলাফা]

ভারতবর্ষের জনপ্রিয় আলেম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহ) [যিনি ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন] খিলাফত ধর্মসের প্রাক্তালে ১৯২০ সালে তাঁর লিখিত মাসালা-ই-খিলাফত গ্রন্থে বলেন, “খিলাফত ছাড়া ইসলামের অস্ত্র অসম্ভব। তাই ভারতের মুসলিমদের তাদের সমস্য প্রচেষ্টা ও শক্তি নিয়ে এর জন্য কাজ করতে হবে।”

মুফতি মুহাম্মদ শাফী (রহ)-এর মতে, “পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যত মুমিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য।” [তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ইফাবা সংস্করণ, ২০০৬, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৯]

সুতরাং যদি মুসলমানরা তাদের ভেতর থেকে একজন খলীফা নির্বাচন থেকে বিরত থাকে, তবে সামগ্রিকভাবে পুরো মুসলিম জাতি খুব বড় কবীরা গুনাহর কাজ করে। যদি তারা এই দায়িত্ব পালন না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তের প্রতিটা মুসলমানের উপর এই দায়িত্ব পালন না করার গুনাহ আরোপিত হবে। যদি মুসলমানদের কোনো দল এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে এবং অন্যরা তা থেকে বিরত থাকে, তবে যারা সচেষ্ট থাকে তারা ব্যতীত অন্যান্যদের উপর এই গুনাহ আরোপিত হবে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে এমন একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন যা তারা পালন করেনি কিংবা পালনের চেষ্টাও করেনি। এভাবে তারা এই পৃথিবীর জীবনে ও পরকালে কঠিন শাস্তি ও লজ্জার ভাগী হবে।

২. ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার অপরিহার্যতা

সিয়াসাত (রাজনীতি) শব্দটি এসেছে আরবী মূল ক্রিয়া সাসা, ইয়াসুসু, সিয়াসাতান থেকে যার অর্থ হচ্ছে কারো বিষয়াদি দেখাশোনা করা। আল মু'জাম আল ওয়াসীত অভিধানে জনগণকে শাসন করা ও নেতৃত্ব দেয়াকে সিয়াসাত বলা হয়েছে। সুতরাং রাজনীতি বা সিয়াসাত বলতে উম্মাহর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়াদি দেখাশোনা করাকে বোঝায়। এই কাজটি রাষ্ট্রশক্তি ও উম্মাহ নিজেই করে থাকে। রাষ্ট্রশক্তি রাজনৈতিক কার্যবলি বাস্তুবায়ন করে এবং উম্মাহ সেই বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে জবাবদিহি করে। এই রাজনৈতিক কাজটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই হাদীসে:

كَانَتْ بُنُوْفُ إِسْرَائِيلَ تَسْوُسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ ...

বনী ইসরাইলের সিয়াসাত (রাজনৈতিক কাজ তথা শাসন) করতেন নবীগণ...। [বুখারী]

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সমগ্র জীবনে সিয়াসাত তথা জনগণকে শাসন করা, নেতৃত্ব দেয়া, জনগণের বিষয়াদি দেখাশোনা করার রাজনৈতিক কাজটি সুস্পষ্টভাবে বাস্তুবায়ন করে গিয়েছেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেখানো পদ্ধতিতে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা বা অনুরূপ একটি আন্দোলনরত দলের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য একটি আবশ্যিক বিষয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَىٰ أَخْيَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاٰءُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম। [সূরা আলে ইমরান : ১০৪]

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাদের মাঝে অবশ্যই এমন একটি সুসংগঠিত দল থাকে, যে দল নিম্নোক্ত দুটি কাজ সম্পাদন করবে:

১. খাইর তথা ইসলামের প্রতি আহ্বান করা।

২. আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ) করা।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত মা'রফ (সৎকর্ম)-এর প্রতিষ্ঠা ও মুনকার (অসৎকাজ)-এর বিলুপ্তি কার্যকর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন, একমাত্র শাসকই পারে হৃদুদ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মা'রফ কার্যকর করতে। ...আল্লাহ বলেন: আমি যদি তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তবে তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। তাদের কাজের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। [সূরা হাজ: ৪১] [জামিউ আহকামিল কুরআন, ৪৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭]

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনিবার্যতার কারণে এই আয়াতে বর্ণিত দলটি রাজনৈতিক দল হতে বাধ্য। কেননা কোনো আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বা কোনো কুফর রাষ্ট্রশক্তিকে পরিবর্তন করার আন্দোলন পুরোপুরিই রাজনৈতিক কাজ।

তাছাড়া এদলটি এই দৃষ্টিভঙ্গিতেও রাজনৈতিক দল যে, দলটির কাজ হবে ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা ও আমর বিল মা'রফ এবং নাহি আনিল মুনকার করা। একাজের মধ্যে শাসকদেরকে ভালো কাজ করতে বলা এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখাও অন্তর্ভুক্ত। বরং শাসকদেরকে কাজকর্মের ব্যাপারে ভালো-মন্দের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা এবং তাদেরকে উপদেশ দেয়াই সবচেয়ে বড় আমর বিল মা'রফ এবং নাহি আনিল মুনকার। আর এটিই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কাজ। রাসূল (সা) বলেছেন,

مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

সকালে জেগে ওঠে যে মুসলিমদের নিয়ে চিন্তি হয় না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
[কানজুল উম্মাল]

সুতরাং রাজনীতিতে অংশ নেয়া সকল মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর ফরয। সমাজে যখন জুলুম, অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন ওই সমাজে বসবাসরত মুসলমানদের জন্য ওই সমাজ পরিবর্তন করার জন্য কাজ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসলে সবাই একসাথে শাস্ত্রিয়ত্ব হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য তোমাদের উচ্চ ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। [সূরা আলে ইমরান: ১১০]

এ বিষয়ে বহু হাদীসও রয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার জন্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَ اللَّهُ أَنْ
يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন, তোমাদেরকে অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে, না হলে অবশ্যই আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না। [তিরমিয়ি]

তিনি (সা) বলেন,

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تَحَاضِنَ عَلَى الْخَيْرِ أَوْ لَيُسْتَحْتَنَ كُمْ اللَّهُ
جَمِيعًا بِعَذَابٍ أَوْ لَيُؤْمِرُنَ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং লোকদের কল্যাণময় কাজের জন্য উদ্বৃদ্ধ করব। অন্যথায় আল্লাহ কোনো আয়াবের মাধ্যমে তোমাদের ধৰ্মস করে দেবেন কিংবা তোমাদের মধ্য থেকে খারাপ লোকদেরকে তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দেবেন। এসময় তোমাদের মধ্যকার ভালো লোকেরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, কিন্তু তা করুল হবে না। [মুসনাদে আহমদ]

আরু দাউদে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِيهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْمَلُهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ

যারা কোনো অত্যাচার হতে দেখেও অত্যাচারীর হাত ধরে তাকে বিরত না রাখবে, তখন আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি দিয়ে ছেয়ে ফেলবেন।

হ্যরত আরু বকর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি :

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْمَلُهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

মানুষ যখন কোনো অসৎকাজ দেখে আর তারা সেটাকে পরিবর্তন করে না, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপকভাবে তাঁর আয়াবে ছেয়ে ফেলবেন। [ইবনে মাজাহ]

আবু দাউদে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন:

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُؤْشِكُ أَنْ يَعْمَلُهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

যখন কোনো জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং তা পরিবর্তন করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেউই তা পরিবর্তন করে না, তখন আল্লাহ গোটা জাতির উপর শাস্তি নায়িল করেন যা তাদের সকলকে ছেয়ে ফেলে।

একই রেওয়ায়াতে আরো আছে:

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثُرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ

যে জাতির মধ্যে পাপাচার হচ্ছে এবং পাপকারীর চেয়ে পাপ থেকে বিরত লোকের সংখ্যা অনেক বেশি... (তারাও পাপে বাধা না দিলে একই পরিণতি)।

এমনকি পুরো জাতির মধ্যে কেবলমাত্র একজনও যদি প্রকাশ্যে মুনকার (অসৎকাজ) করে এবং অন্যরা তা প্রতিহত করে না তাহলে সবাই দুনিয়াতে থাকতেই আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখি হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا

যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপাচার করে আর সে জাতির লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা পরিবর্তন করে না, তখন তাদের মৃত্যুর আগেই আল্লাহর আয়াব তাদের উপর পতিত হবে। [আবু দাউদ]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَ أَنِيهِمْ
وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল বিশেষ কোনো ব্যক্তির পাপাচারের জন্য জনসাধারণকে শাস্তি দেন না। কিন্তু যখন তারা (জনসাধারণ) তাদের সামনে মুনকার (অসৎকাজ) হতে দেখে এবং তা প্রতিহত করে না, যদিও তাদের তা প্রতিহত করার ক্ষমতা রয়েছে। তারা যদি এরূপ করে তখন আল্লাহ ব্যক্তিবিশেষ ও জনসাধারণ উভয়কেই শাস্তি দেন। [আহমদ]

এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদানকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। হাদীসসমূহ মুসলিমদের বাধ্য করে সর্বদা শাসকদের সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎকাজ হতে বাধা প্রদান করতে। কারণ হাদীসসমূহের নির্দেশটি সার্বজনীন বিধায় অন্য সকলের পাশাপাশি শাসকদের জন্যও প্রযোজ্য। তবে শাসকদেরকে সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় হতে বাধাদানের গুরুত্বকে সামনে রেখে শুধুমাত্র শাসকদের জবাবদিহিতার বিষয়ে আলাদা সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةً حَقًّا عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। [তিরমিয়]

তিনি (সা) আরো বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمِ أَنْ تَقُولَ لَهُ إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُودِعَ مِنْهُمْ

যদি তোমরা দেখ যে আমার উম্মত কোনো জালেমকে একথা বলতে ভয় পাচ্ছ যে, ‘নিশ্চয়ই তুমি একজন জালেম,’ তাহলে সেই উম্মতকে বিদায় (অর্থাৎ এটা উম্মতের জন্য বিদায় বা পতনের সংকেত)। [আহমদ, তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী]

এসব হাদীস শাসকদের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণ ও তাদের কঠোরভাবে জবাবদিহি করার জন্য মুসলিম জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট অর্থবোধক হাদীস।

অতএব কঠোর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেসব শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া বাধ্যতামূলক যারা জনগণের অধিকার হ্রণ করে অথবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে। রাসূল (সা) নিজেও উপরিউক্ত হাদীসে এটাকে সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শাসককে প্রশ্নের মুখোমুখি করা মুসলমানদের জন্য যে বাধ্যতামূলক এটা

প্রমাণ করার জন্য এই বক্তব্যই যথেষ্ট। শাসকের অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতনকে পরোয়ানা করে মুসলমানদের তার মুখোমুখি হওয়াকে রাসূল (সা) নিজেই নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন যাতে একজন মুসলমান সর্বদাই এরূপ কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত থাকে:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَرَجُلٌ قَالَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ

শহীদদের সর্দার হাময়া বিন আবদুল মুত্তালিব এবং ওই ব্যক্তিও, যে অত্যাচারী শাসককে (সৎকাজে) আদেশ ও (অসৎকাজে) নিষেধ করার পর (ওই শাসক) তাকে হত্যা করে ফেলে। [হাকিম]

কানজুল উম্মাল-এর রেওয়ায়াতে আছে:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ

শহীদদের সর্দার হাময়া বিন আবদুল মুত্তালিব এবং ওই ব্যক্তিও, যে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে (সৎকাজে) আদেশ ও (অসৎকাজে) নিষেধ করার পর (ওই শাসক) তাকে হত্যা করে ফেলে।

এথেকে বোঝা যায় যে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বদাই কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং জোবনের বিনিময়ে হলেও প্রকাশ্যে তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করতে হবে।

এই দীর্ঘ আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে ইসলামে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং একাজের পরিধি অনেক ব্যাপক ও শাসকবর্গ বিশেষভাবে এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ইসলামের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল করা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরয।

৩. কুফরী দলকে সমর্থন করার পরিণাম

কিন্তু ইসলামী রাজনৈতিক দলে অংশ নেয়ার ফরযকে বাদ দিয়ে বর্তমানে অনেক মুসলিমই জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, পুঁজিবাদী, গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি জাহেলী আদর্শের দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এদের পরিণতি ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেন,

وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاثَ جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ...

যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের কোনো বিষয়ের দিকে আহবান জানাবে, সে জাহানামের ইন্ধন হবে। এক ব্যক্তি জিজেস করলো, যদিও সে নামাজ পড়ে ও রোয়া রাখে? তিনি (সা) বললেন, যদিও সে নামাজ পড়ে ও রোয়া রাখে। [তিরমিয়ি]

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াতে আছে:

وَمَنْ دَعَابِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاثَ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ
صَلَّى؟ قَالَ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের কোনো বিষয়ের দিকে আহবান জানাবে, সে জাহানামের ইন্ধন হবে। তারা জিজেস করলো, যদিও সে রোয়া রাখে ও নামাজ পড়ে? তিনি (সা) বললেন, যদিও সে রোয়া রাখে ও নামাজ পড়ে ও নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে।

জনগণের উপর জুলুমকারী এসমস্ত দলে যোগ দিলে কোনো ব্যক্তি ইসলাম থেকেই বের হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ يَقُولُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

যে ব্যক্তি কোনো জালিমের সাথে চলে তার শক্তি বৃদ্ধি করে, অথচ সে জানে ওই ব্যক্তি জালিম, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। [বায়হাকী]

8. খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

দারুল কুফরকে দারুল ইসলামে রূপান্বিত করার ক্ষেত্রে রাসূল (সা)-এর সীরাতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা ফরয়:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

যে ব্যক্তি রাসূলকে মানলো, সে মূলত আল্লাহকেই মানলো.....। [সূরা নিসা: ৮০]

এফেতে আমাদেরকে অবশ্যই দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে।

৪.১ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর

‘দার’ শব্দটি আরবি ভাষায় বহু অর্থে ব্যবহার হয়, যেমন: এলাকা/মহল্লা, ঘর, বসতবাড়ি, ভূমি ইত্যাদি। শরীয়াতের পরিভাষায়, দারুল ইসলাম বলতে এমন ভূমিকে বোঝায় যেটি ইসলামের আইন দ্বারা শাসিত হয় এবং যার নিরাপত্তা রক্ষিত হয় ইসলাম দ্বারা অর্থাৎ মুসলিমদের কর্তৃত ও প্রতিরক্ষা দ্বারা। এমন কি, যদি সেই ভূমির অধিকাংশ অধিবাসী অমুসলিমও হয়, তবুও সেটি দারুল ইসলাম।

দারুল কুফর বলতে এমন ভূমিকে বোঝায় যেটি কুফরের আইন দ্বারা শাসিত হয় এবং যার নিরাপত্তা ইসলাম দ্বারা রক্ষিত হয় না অর্থাৎ মুসলিমদের কর্তৃত ও প্রতিরক্ষা দ্বারা এর নিরাপত্তা রক্ষিত হয় না। এমন কি, যদি সেই ভূমির অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিমও হয়, তবুও সেটি দারুল কুফর।

মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ আলেমগণ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন।

ইমাম আল-কাসানী (রহ) বলেন, হানাফী আলেমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, ইসলামের আইন কর্তৃত্বশীল হলে দারুল কুফর দারুল ইসলামে বৃপ্তান্তিত হয়। আমাদের ইমাম (আবু হানিফা) বলেন, তিনটি ক্ষেত্রে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হয়: যখন আইনগুলো কুফরের আইনে পরিণত হয়, যখন কুফর রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত থাকে অথবা যখন মুসলিম কিংবা যিন্মদের জন্য আর কোনো নিরাপত্তা অবশিষ্ট থাকে না। [বাদাইস সানাই, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১]

ইমাম আল-সারখাসী (রহ) বলেন, ইসলামী আইনসমূহ কর্তৃত্বশীল হলে একটি ভূমি দারুল ইসলামে পরিণত হয়। [শরহে সীরাতুল কাবীর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৯৭]

কাজি আবু ইয়া'লা (রহ) বলেন, যে দেশে ইসলামের পরিবর্তে কুফর বাস্বায়িত হয়, তা দারুল কুফর। [আল-মু'তামাদ ফী উসুলিদ-দ্বীন, পৃষ্ঠা ২৭৬]

ইবনুল কাহিয়িম (রহ) বলেন, জমত্র (অধিকাংশ) আলিমদের মতে, দারুল ইসলাম হলো সেই ভূমি যেখানে মুসলিমরা বসবাস করে ও ইসলামের আইনসমূহ কর্তৃত্বশীল। ইসলাম কর্তৃত্বশীল না হলে সেটি দারুল ইসলাম নয়। [কিতাব আহকাম আহলিল জিম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৬]

শায়খ তাকিউদ্দিন আন-নাবাহানী (রহ) বলেন,

والحق أن اعتبار الدار دار إسلام أو دار كفر، لا بد أن ينظر فيه إلى أمرين: أحدهما الحكم بالإسلام، والثاني الأمان بآمان المسلمين أي بسلطانهم، فإن توفر في الدار هذان العنصران، أي أن تحكم بالإسلام، وأن يكون أمانها بآمان المسلمين، أي بسلطانهم كانت دار إسلام، وتحولت من دار كفر إلى دار إسلام، أما إذا فقدت أحدهما فلا تصير دار

إسلام

দারুল ইসলাম বা দারুল কুফর বিবেচনা করার ক্ষেত্রে শুন্দি পদ্ধতি হলো দুটো বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা: এক. ইসলামী আইনের শাসন, দুই. মুসলিমদের কর্তৃত্ব দ্বারা নিরাপত্তা। কোনো দেশ যদি এ দুটো উপাদান অর্জন করে অর্থাৎ ইসলামী শাসন ও মুসলিমদের কর্তৃত্বে নিরাপত্তা লাভ করে, তাহলে দেশটি দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে রূপান্ব রিত হয়। আবার যদি দেশটিতে এ দুটো উপাদানের কোনো একটি না থাকে, তাহলে সেটি আর দারুল ইসলাম থাকে না। [আশ-শাকসিয়্যাহ আল-ইসলামীয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৯]

বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর কোথাও বর্তমানে ইসলামী আইনের পরিপূর্ণ শাসন বা ইসলামী কর্তৃত্বে নিরাপত্তার বিধান নেই। সুতরাং নিঃসন্দেহে বাংলাদেশসহ প্রতিটি মুসলিম দেশ তথা সারা পৃথিবী বর্তমানে দারুল কুফর। বর্তমান বিশ্বে বিপর্যয়ের মূল কারণও হলো এই ইসলামী আইনের অনুপস্থিতি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রহ) যথার্থই বলেছেন,

الْفِتْنَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَقُوْمُ بِأَمْرِ النَّاسِ

জনগণের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করার জন্য কোনো ইমাম না থাকলে ফিতনা [বিপর্যয় ও পাপাচার] সৃষ্টি হয়। [আল ফুরু'লি ইবনে মুফলিহ]

বিপর্যয় ও পাপাচারপূর্ণ এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৪.২ সঠিক পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কী জীবনে অনুসৃত পদ্ধতিই খিলাফত প্রতিষ্ঠার একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। কেননা এটি আল্লাহ সুবনাহ্তা'য়ালার ওহী দ্বারা নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি:

فُلْ هَذِهِ سَيِّلِيٰ أَدْعُو إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

“বল: এটাই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে সজ্ঞানে মানুষকে আহ্বান করি এবং আমার অনুসারীরাও...।” [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

রাসূল (সা) তিনটি ধাপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন।

প্রথম ধাপ: দল গঠন – ব্যক্তি-পর্যায়ে দাওয়া শুরু (دور التتفيف)

يَا يَاهَا الْمُدَّثِّرُ فَإِنِّي قُمْ فَأَنْذِرْ مَكْرُورًا وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ

হে বন্ধাবৃত, উঠুন ও সতর্ক করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। [সূরা মুদ্দাসসির: ১-৩]

এই আয়াতসমূহ নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে নিয়ে তিনি একটি দাওয়াকারী দল গঠন করেন। আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী বলেন: ‘তিন বছর যাবৎ দ্বিনের কাজ গোপনভাবে চললো। এ সময় ঈমানদারদের একটি দল তৈরি হয়ে গেল। এরা ভাতৃত্ব এবং সহায়তায় ওপর কায়েম ছিল। তারা আল্লাহর পয়গাম পৌছাচ্ছিল এবং এ পয়গামকে একটা পর্যায়ে উন্নীত করতে চেষ্টা করেছিলেন।’ [আর-রাহীকুল মাখতুম, আল কুরআন একাডেমী লঙ্ঘন, পৃষ্ঠা ৯২]

পরবর্তীতে আল্লাহ সুবহানাহ্ত ওয়া তা'য়ালা সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নম্বর আয়াতে দল গঠনের নির্দেশ দেন:

তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আন্দান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম।

এ আয়াতের তাফসীরে আবু জাফর আত তাবারী (রহ) বর্ণনা করেন: দাহ্যাক বলেছেন,

هم خاصة أصحاب رسول الله

তারা বিশেষভাবে রাসূলের সাহাবীগণ। [তাফসিরে ইবনে জারীর]

একইভাবে ইবন কাসীর (রহ) এ আয়াতের তাফসারে দাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেন,

هم خاصة الصحابة

তারা বিশেষভাবে সাহাবীগণ।

ব্যক্তি-পর্যায়ে দাওয়াতের এই পর্বটি তিন বছর স্থায়ী ছিল। এসময় রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে দারুল আরকামে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন।

দ্বিতীয় ধাপ: সমাজ পরিবর্তনের প্রকাশ্য আন্দোলন (دور التفاعل)

ইমাম আবু জাফর আত-তাবারী (রহ) বলেন, “নবুয়তের তিন বছর পর আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রকাশ্যে দাওয়া করার নির্দেশ দেন এই আয়াতের মাধ্যমে:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِنُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন। [সূরা হিজর: ৯৪]” [তারিখে তাবারী, ষষ্ঠ খণ্ড]

শফিউর রহমান মোবারকপুরী বর্ণনা করেন, ‘এরপর রাসূল (সা) পৌত্রিকদের নোংরামি ও অকল্যাণসমূহ প্রকাশ্যে তুলে ধরে মিথ্যার পর্দা উন্মোচিত করেন। তিনি মৃত্তিসমূহের অন্ত্বাঃসারশূন্যতা ও মূল্যহীনতা তুলে ধরে তাদের স্বর্পণ উদঘাটন করেন।’ [আর-রাহীকুল মাখতুম, আল কুরআন একাডেমী লভন, পৃষ্ঠা ৯৫]

যেসব গোত্রপতির হাতে মক্কার শাসন ব্যবস্থা ন্যস্ত্ব ছিল, যেমন: ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা^২, আবু জেহেল^৩, আবু সুফিয়ান^৪, আবু লাহাব^৫, উবাই বিন খালফ^৬, উমাইয়া বিন খালফ^৭ – এদেরকে আক্রমণ করে কুরআনে একের পর এক আয়াত নাযিল হতে থাকে।

২. সূরা মুদ্দাস্সির: ১১-২৫, সূরা কালাম: ১০-১৬

৩. সূরা আলাক: ১৬-১৯, সূরা মুদ্দাস্সির: ৩১

৪. সূরা মাউন: ১-৩

৫. সূরা লাহাব

এসব কাফের নেতাও রাসূল (সা) ও সাহাবীদের ওপর ভীষণ জুলুম-নির্যাতন চালায়। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল (সা) অভিশাপ দিয়েছিলেন,

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَتْبَةَ وَأُمَيَّةَ
بْنِ خَلْفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعِيطٍ

হে আল্লাহ, আরু জাহল, উত্বাহ ইবন রাবিয়া, শায়বাহ ইবন রাবিয়া, উমাইয়া ইবন খালফ, উবাই ইবন খালফের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও। [বুখারী]

শত নির্যাতন-দমন-নিপীড়ন সত্ত্বেও রাসূল (সা) ও সাহাবীগণ দৃঢ়ভাবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। কুরাইশ নেতারা কয়েকবার সমরোতার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে নবুয়তের দশম বর্ষে আরু তালিব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে আরু জাহল, উমাইয়া, আরু সুফিয়ানসহ পঁচিশজন কুরাইশ নেতা সমরোতার জন্য আরু তালিবের শরণাপন্ন হয়। [আর-রাইকুল মাখতুম, আল কুরআন একাডেমী লস্বন, পৃষ্ঠা ১৩১]

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, আরু তালিব রাসূল (সা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে তাঁকে বললেন, ‘তাতিজা, এরা তোমার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তারা এসেছে তোমার নিকট থেকে একটা কথা নিতে এবং বিনিময়ে তোমাকে একটা প্রতিশ্রূতি দিতে।’ [সীরাতে ইবনে হিশাম, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৬]

শফিউর রহমান মোবারকপুরী বর্ণনা করেন, একথা শুনে রাসূল (সা) কুরাইশ প্রতিনিধি দলকে বললেন,

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَعْطَيْتُكُمْ كَلِمَةً تَكْلِمُتُمْ بِهَا، مَلِكَتُمْ بِهَا الْعِجْمَ
‘আপনারা বলুন, আমি যদি এমন কোনো কথা পেশ করি, যে কথা গ্রহণ করলে আপনারা আরবের শাসক হবেন এবং অনারবরাও আপনাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তখন আপনারা কী করবেন?’.....

আরু জাহেল বললো, ‘বলো সেই কথা। তোমার পিতার শপথ, এধরনের কথা একটি কেন দশটি বললেও আমরা মানতে প্রস্তুত রয়েছি।’ রাসূল (সা) বললেন, ‘আপনারা বলুন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَخْلِعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ

৬. সুরা ইয়াসিন: ৭৬-৭৯

৭. সুরা হুমায়াহ: ১-৯

‘لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجَى كُوَنَّوْ أَنْجَى عَمَّا يَرَى’
‘لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجَى كُوَنَّوْ أَنْجَى عَمَّا يَرَى’

একথা শুনে কুরাইশরা হাতে তালি দিয়ে বললো, মহাম্মদ! আমরা এক খোদা মানবো! আসলেই তোমার ব্যাপার-স্যাপার বড়ো অঙ্গুত! [আর-রাহীকুল মাখতুম, আল কুরআন একাডেমী লভন, পৃষ্ঠা ১৩২]

তৃতীয় ধাপ: প্রভাবশালীদের সমর্থনে শাসনকর্তৃত্ব অর্জন (دُور الحُكْم)

হযরত আলী (রা) বলেন,

لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيًّهُ أَنْ يَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ، خَرَجَ وَأَنَا مِنْهُ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَيْ مِنِي،
حَتَّى دَفَعَنَا إِلَى مَجَالِسِ الْعَرَبِ

“যখন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরব গোত্রগুলোর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করার নির্দেশ দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ও আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মিনায় আরবগোত্রগুলোর কাছে যেতেন।” [ফাতুল বারী, হাকিম, বাযহাকী, আবু নুআইম]

অনুরূপ রেওয়ায়াত রয়েছে ইবনে কাসার-এর বিদায়া ওয়ান নিহায়ার তৃতীয় খণ্ডে।

এই ধাপে রাসূলুল্লাহ (সা) আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নুসরাহ (সামরিক সমর্থন) আদায় করার চেষ্টা করেন। ইমাম যুহুরী (রহ) বলেন, রাসূল (সা) যেসব গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, তারা হচ্ছে বানু আমের ইবনে সায়া'সায়া, মুহারিব ইবনে খাসবা, ফাজারাহ, নাস্সান, মায়রা, হানিফা, সালিম, আবাস, বানু নাসর, বানু আলবাকা, কিলাব, হারিস ইবনে কাব আসরাহ ও হায়ারিমা। কিন্তু কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। [তিরমিয়ি]

ইমাম তিরমিয়ি (রহ) বর্ণনা করেন, উকাজ মেলার সময় রাসূল (সা) যারা ইসলাম গ্রহণ করবে ও প্রচার করবে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন এবং সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিতেন। তিনি (সা) প্রকাশ্যে বলতেন, তারা যদি তাওহীদ গ্রহণ করে ও তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেয়, তাহলে তারা নিশ্চিত সাফল্য পাবে, আরবের শাসক হবে এবং পারস্যকে পরাভূত করবে। [তিরমিয়ি]

সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) এভাবে ৪০টিরও বেশি গোত্রের কাছে এই সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। অবশেষে ইয়াসরিব (মদীনা)-এর আওস ও খাজরায় গোত্রের কাছ থেকে তিনি নুসরাহ লাভ করেন।

ইবনে হিশাম (রহ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) আউস ও খাজরায় গোত্রের নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার চাই যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও সন্ত্বানদের যেভাবে বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকো, আমাকেও সেভাবে রক্ষা করবে।

তৎক্ষণাত্ত বারা ইবনে মা'রুর (রা) রাসূল (সা)-এর হাত ধরে বললেন, ‘হ্যাঁ। যে মহান সত্ত্বা আপনাকে নবী করে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমরা স্বজন ও স্ত্রী-সন্ত্বানদের যেভাবে বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকি, আপনাকেও সেভাবে রক্ষা করবো। হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার আনুগত্য করার শপথ গ্রহণ করলাম। আল্লাহর শপথ, আমরা যুদ্ধ ও অস্ত্রের মধ্যেই লালিত পালিত। আমরা পুরুষাগুরুমে যোদ্ধা জাতি।’ [সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ১১৯]

৫. ‘এটাই আমার পথ’

বর্তমানে কোনো দারুল কুফরকে দারুল ইসলামে পরিণত করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই রাসূল (সা) ও সাহাবীদের অনুসৃত পথকে বেছে নিতে হবে। সেজন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে:

৫.১ দল গঠন:

ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরী করা যার জীবনের সব কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আলাহুর সন্তুষ্টি সন্ধান করা। এর মানে হচ্ছে সব কাজে হালাল হারাম মাপকাঠি মেনে চলা; সেই সাথে নিজেকে আরো বিশুদ্ধ করার জন্য ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য মাগত আল্লাহুর স্মরণ (জিকির)-এ রত থাকা, বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করা এবং আল্লাহুর কাছে মাগফিরাত কামনা করা। এরপ ব্যক্তিরা আল্লাহুর সাথে সম্পর্ক, রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালোবাসা, জ্ঞান, দক্ষতা ও সততায় এমনভাবে গড়ে উঠবেন যেন তারা জাহেল সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে পারেন। আল্লাহুর পথে জীবন উৎসর্গকারী মানুষরা সুশৃঙ্খলভাবে একটি দলের অধীনে কাজ করবেন এবং যথাযথ লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে সামনে রেখে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে শামিল হবেন।

৫.২ সমাজ পরিবর্তনের প্রকাশ্য আন্দোলন:

সমাজে প্রচলিত দুষ্ট চিন্ম, চেতনা ও আবেগ-অনুভূতিগুলোকে পরিবর্তন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এজন্য সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত চিন্মগুলো সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের সমাজে চলছে পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানুষের সার্বভৌমত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, শাসক শ্রেণীর স্বার্থের রাজনীতি, অন্ধভাবে উপনিবেশবাদী প্রভুদের নির্দেশের অনুসরণ ইত্যাদি দুষ্ট চিন্ম ও পদ্ধতির চর্চা ও বাস্বায়ন। সমাজ পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সমাজের এসব দুষ্ট চিন্ম ও নিয়ম-কানুনকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, যেমনটি করেছিলেন রাসূল (সা) তাঁর মক্কী জীবনে। বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চর্চাকে আলোচনায় এনে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে যে আলোচ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যে সীমাহীন দুর্নীতি ও জুলুম চলছে তার মূল উৎস সমাজে প্রচলিত দুষ্ট চিন্ম ও নিয়ম-পদ্ধতি। অপরদিকে ইসলামকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন জনগণ বুঝতে পারে যে সমাজে মানুষের চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ইসলাম। আর এটা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে চলমান জীবন ও ঘটমান বাস্বতা থেকে বিভিন্ন ইস্যু (যা জনগণের চিন্মকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করছে) নিয়ে মানুষের সাথে আলোচনা করা এবং মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া কীভাবে সমাজে প্রচলিত চিন্ম ও আইনগুলোর সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদী শাসক শ্রেণী ও তাদের বিদেশী প্রভুরা জনগণকে শোষণ ও নির্যাতন করছে; সেই সাথে ইসলামী চিন্ম চেতনা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা (খিলাফত) কীভাবে মানুষকে এসব মানবরচিত আইনের জুলুম থেকে মুক্ত করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও অগ্রগতির ধারা প্রতিষ্ঠিত করবে, তাও জনগণের সামনে উপস্থাপন করা।

৫.৩ প্রভাবশালীদের সমর্থনে শাসনকর্তৃত্ব অর্জন:

যখন জনগণ আস্থার সাথে বুঝতে পারবে যে একমাত্র ইসলামী জীবনাদর্শ (Ideology) দ্বারাই আমাদের সব চাহিদা ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত তখন ব্যাপক জনমতকে ভিত্তি করে সমাজের নেতৃত্বানীয় সৎ মানুষদের সহযোগিতায় বর্তমান পুঁজিবাদী জালিম নেতৃত্ব তথা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে ইসলামী সরকার বা রাষ্ট্রব্যবস্থা (খিলাফত) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

আর এটাই আমাদের পথ।

রাসূল (সা) আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন,

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ مِثْلُ أَجْرِ أَوْلَاهُمْ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا
عَنِ الْمُنْكَرِ

আমার উম্মতের শেষ দিকে এমন কিছু লোক হবে যারা প্রথম দিককার লোকদের মতো পুরস্কৃত হবে, কেননা তারা সৎকাজে আদেশ দেবে ও অসৎকাজের নিষেধ করবে...।
[দালায়েলুন নুবুয়্যাহ - বাযহাকী]

একই রকম বর্ণনা রয়েছে মুসনাদে আহমদ, ৪৬ খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠায়: নিচেরই আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক প্রথম দিককার লোকদের মতো পুরস্কৃত হবে, যারা অসৎকাজের নিষেধ করবে।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে রাসূল (সা) ও সাহাবীদের অনুসৃত পথের উপর দৃঢ় রেখ যেন আমরা এই জমিনে তোমার খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

৬. ইসলাম প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত ভুল পদ্ধতি ও চিন্সমূহ

উপরে বর্ণিত রাসূল (সা)-এর অনুসৃত পদ্ধতি ছাড়া অপর সব পদ্ধতিই বাতিল, প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কারণ রাসূল (সা) বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

যদি কেউ এমন কোনো কাজ করে যে ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশ নেই, তাহলে সেই কাজ অত্যাখ্যাত। [বুখারী, মুসলিম]

৬.১ রাজনীতিবিবর্জিত দাওয়াত:

রাসূল (সা) মক্কী জীবনে গোত্রীয় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু রাসূলুল্লাহ (সা) নন, সকল নবী-রাসূলই তাদের স্ব-স্ব যুগের জালিম শাসক ফেরাউন-নমরুন্দ-জালুতদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাই রাজনীতিবিবর্জিত দাওয়াত ইসলামসম্মত হতে পারে না।

মদীনায় হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন,

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ
سُلْطَانًاً نَّصِيرًاً

...হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যসহকারে এবং আমাকে বের করে নিয়ে যান সত্যসহকারে এবং দান করুন আমাকে আপনার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় শক্তি। [সূরা বনী ইসরাইল: ৮০]

অর্থাৎ আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান কর, অন্যথায় কোনো রাষ্ট্রকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও যেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে বিশ্বের মহাবিপর্যয়কে প্রতিরোধ ও সংশোধন করতে পারি, যেন অশ্লীলতা ও পাপের এই প্লাবনের মোকাবিলা করতে পারি, যেন সুবিচারপূর্ণ আইনকে কার্যকর করতে পারি। [হাসান বসরী, কাতাদাহ, ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর - সবাই আয়াতের এই তাফসীর করেছেন]

ইবন আবু আসের এক বর্ণনায় এসেছে,

الإِسْلَامُ وَالسُّلْطَانُ أَخْوَانٌ تَوَمَانْ لَا يُصْلِحُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ فَإِلَّا سَلَامُ أُسْ
وَالسُّلْطَانُ حَارِثٌ، وَمَا لَا أُسْ لَهُ يَهْدِمُ وَمَا لَا حَارِثٌ لَهُ ضَائِعٌ

ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় শক্তি হচ্ছে যমজ ভাই - একে অন্যকে সুদৃঢ় করে। ইসলাম হচ্ছে ভিত্তি আর রাষ্ট্রীয় শক্তি হচ্ছে নিরাপত্তারক্ষী, যার ভিত্তি নেই সে ধ্বংস হয়ে যায়। আর যার নিরাপত্তারক্ষী নেই, তা বিলীন হয়ে যায়। [কানজুল উম্মাল]

রাষ্ট্র থেকে কুরআনের আইন উঠে গেলে কী করতে হবে, সে প্রসঙ্গে রাসূল (সা)-এর নির্দেশ হলো:

...أَلَا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ مَبْعَدٌ عَنِ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ
وَالسُّلْطَانَ سَيَفِرْ قَانِ، فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ، أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَّرَاءٌ يَقْضُونَ
لَأَنفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ، إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتْلُوكُمْ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، نُشِرُوا
بِالْمَنَاسِيرِ، وَحُمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ، مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

.... জেনে রাখো, নিশ্চয়ই ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান আছে। অতএব তোমরা কিতাবের (কুরআনের) সঙ্গে ঘূর্ণায়মান হও যেদিকে তা ঘূরে। মনে রাখবে, কিতাব (কুরআন) ও শাসনক্ষমতা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তবে সাবধান, তোমরা কিতাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। মনে রাখো, ভবিষ্যতে এমন কিছু শাসক আসবে যারা নিজেদের জন্য যে ফয়সালা করবে তোমাদের বিষয়ে সে ফয়সালা করবে না। যদি তোমরা তাদেরকে অমান্য কর তাহলে তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে। আর যদি তোমরা তাদেরকে মেনে চলো, তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো: ‘হে রাসূলুল্লাহ (সা), তখন আমরা কী করবো?’ রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: তোমরা তখন তাই করবে যা ঈসা (আ)-এর সঙ্গীরা করেছিলেন, তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে, ফাঁসি দেয়া হয়েছে, (কেননা) আল্লাহর অবাধ্য হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে মৃত্যুবরণ করা অনেক উত্তম। [মু'জাম আল কাবীর - তাবারানী, আল জামে' আস-সগীর]

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। [শু'য়াবুল ঈমান - বায়হাকী]

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمْرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ

শহীদদের সর্দার হাময়া বিন আবদুল মুত্তালিব এবং ওই ব্যক্তিও, যে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে (সৎকাজে) আদেশ ও (অসৎকাজে) নিষেধ করার পর (ওই শাসক) তাকে হত্যা করে ফেলে। [কানজুল উম্মাল]

এসব হাদীসে রাসূল (সা) পরিষ্কারভাবেই কুরআনবিরোধী শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া শাসকদের জবাবদিহিতার ফরয়টি বাদ দিয়ে যারা দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবীর মতো সুন্নত-মুস্ত্রাহাব-মুবাহ নিয়ে ব্যস্ত, তারা কখনোই সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে প্রদত্ত দাওয়াকারী দলের ‘সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’-এর ফরয দায়িত পালন করছে না। মুফতি মুহাম্মদ শাফী (রহ)-এর মতে, “ওয়াজিব কাজের বেলায় ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’ ওয়াজিব এবং মুস্ত্রাহাব কাজের ক্ষেত্রে তা মুস্ত্রাহাব। উদাহরণত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ফরয। সুতরাং বেনামায়ীকে নামাযের আদেশ করা প্রত্যেকের উপর ফরয। নফল নামায মুস্ত্রাহাব; এর জন্য উপদেশ দেওয়াও মুস্ত্রাহাব। এছাড়া আরেকটি জরুরি শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। তা হল এই যে, মুস্ত্রাহাব কাজের বেলায় সর্বাবস্থায় নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে এবং ওয়াজিব কাজের বেলায় প্রথমে নম্রতার সাথে এবং প্রয়োজনে কঠোর হওয়ারও অবকাশ আছে। অথচ আজকাল মুস্ত্রাহাব ও মুবাহ কাজের বেলায় বেশ কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়; কিন্তু ওয়াজিব ও ফরয পালন না করলে কেউ টু শব্দটিও করে না।” [তাফসীরে মা’আরেফুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০]

৬.২ সশন্ত্র সংগ্রাম:

সশন্ত্র পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিকে রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমোদন করেননি। তাই সশন্ত্র সংগ্রাম খিলাফত প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না।

নবুয়তের দ্বাদশ সনে পাঁচাত্তর জন ইয়াসরিববাসী আকাবাতে গভীর রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হন। তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য করার শপথ নেন। এই ঘটনাকে বলা হয় দ্বিতীয় বায়াআতে আকাবা। এসময় ইয়াসরিববাসীরা মিনাতে সমবেত জালিম-মুশরিকদের উপর হামলা চালাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইয়াসরিববাসীদের অন্যতম লড়াকু ব্যক্তি আববাস ইবনে উবাদা বলেন, “হে রাসূলুল্লাহ (সা), যে আল্লাহ আপনাকে সত্য জীবনবিধানসহ পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আপনি চাইলে আমরা আগামীকালই মিনায় অবস্থানকারীদের উপর হামলা চালাব।”

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَمْ نُؤمِرْ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ ارْجِعُوهَا إِلَى رِحَالِكُمْ

আমাদের এরূপ কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, তোমরা নিজ নিজ কাফেলায় ফেরত যাও। [সীরাতে ইবনে হিশাম]

মক্কী জীবনে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিল - ﴿كُفُواْ أَيْدِيْكُمْ﴾ ↑ কুফুর আইনিয়াকুম অর্থাৎ “তোমাদের হাতসমূহ গুটিয়ে রাখ।” এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছিল ওহীয়ে গাইরে মাতলু বা হাদীসের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে সূরা নিসার ৭৭ নামার আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে, উসামা বিন যায়েদ (রা) বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، كما
أمرهم الله، ويصبرون على الأذى، قال الله: { فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأنّى من العفو ما أمره
الله به

রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ মুশরিকীন ও আহলে কিতাবদের আল্লাহ নির্দেশ মোতাবেক ক্ষমা করে যেতেন, এবং অত্যাচার সহ্য করে যেতেন। [কারণ] আল্লাহ বলেছেন, অতএব তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। [সূরা বাকারা: ১০৯] এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক এক্ষেত্রে ক্ষমার ব্যাপারে সর্বাঙ্গে থাকতেন।

মক্কার কাফেরদের দুর্ব্যবহারের জবাবে অন্তের মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করার অনুমতি প্রার্থনা করলে আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)-কে রাসূল (সা) বলেন:

إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ

প্রকৃতপক্ষে আমি ক্ষমার জন্য আদিষ্ট, অতএব তোমরা লোকজনের সাথে যুদ্ধ করো না। [আল-হাকিম, নাসাই]

মক্কী জীবনে সাহাবীগণ নির্মমভাবে নিয়াতিত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বলতেন,

إِصْبِرُوا فَإِنِّي لَمْ أُوْمِرْ بِالْقِتَالِ

তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, আমাকে এখনো যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। [আল-কাশফ ওয়াল বায়ান]

নবুয়তের অয়োদশ সনে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ রাবুল আলামীনের পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি লাভ করেন। মহানবী (সা) ইয়াসরিবে হিজরত করার পর এর নাম হয় মদীনাতুর রাসূল। মদীনা একটি রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে। আর নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রধান হন রাসূল (সা)। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নাযিল হয় সূরা হজের ২৫ থেকে ৭৮ নম্বর আয়াত। আর এই অংশটির একাংশে আল্লাহ রাবুল আলামীন রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীদের অন্তর্বর্তী অনুমতি প্রদান করেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে, আর আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এই জন্য যে, তারা বলেছিল: আল্লাহ আমাদের রব। [সূরা হাজ়: ৩৯-৪০]

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (রহ) বর্ণনা করেন,

قال ابن العربي : قال علماؤنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحل له الدماء؛ إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى
والصفح عن الجاهل

ইবনুল আরাবী বলেন, আমাদের আলেমগণ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আকাবার বাঁয়াতাত এর আগে কখনো যুদ্ধের ডাক দেননি এবং রক্তপাতকে হালাল করেননি, [বরং] তিনি আদেশ করেছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরার এবং জাহেলদেরকে উপেক্ষা করার।

এই পরিস্থিতি দীর্ঘ বারো বছর অব্যাহত রইল। এ আয়াতটি নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে কুরতুবী বর্ণনা করেন,

قال ابن عباس وابن حبیر : نزلت عند هجرة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلى المدينة .
وروى النسائي والترمذى عن ابن عباس قال : (ما أخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم من
مكة قال أبو بكر : أخرجو نبيهم ليهلكن؛ فأنزل الله تعالى [أذن للذين يقاتلون بأنهم
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير])

ইবন আবাস ও ইবন জাবীর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করার সময় এটি
নাযিল হয়। ইবন আবাস হতে নাসাই ও তিরমিয়ি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন
রাসূল (সা) মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছিল তখন আবু বকর (রা) বলেন, ‘এরা এদের
নবীকে বহিষ্কার করেছে, এদের ধর্ম অনিবার্য।’ অতঃপর আল্লাহ তা’য়ালা নাযিল
করেন: লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে, আর
আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। [সূরা হাজ্জ: 39]

নাসায়ী, ইবন হিকান, হাকিম প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইবন আবাস (রা) বলেন:

هِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَّلْتُ فِي الْقِتَالِ

“যুদ্ধের ব্যাপারে এটিই প্রথম নাযিলকৃত আয়াত।” ইমাম কুরতুবীও একই মত প্রকাশ
করেছেন।

আল-বাহরুল মুহীত, তাফসীরুল কাবীর, আল-কাশ্শাফ প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে আছে,

وَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَّلْتُ فِي الْقِتَالِ بَعْدَ مَا تُهْكَىٰ عَنْهُ فِي نَيْفٍ وَسَبْعِينَ آيَةً

যুদ্ধের ব্যাপারে এটিই প্রথম নাযিলকৃত আয়াত যা [যুদ্ধ] ইতিপূর্বে সন্তরেরও বেশ
আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

৬.২.১ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগের ও পরের পদ্ধতি

ক. ইমাম ইবনে তাহিমিয়াহ (রহ)-এর সিয়াসা শারী’আহ হতে জানা যায়, ইসলামের
প্রাথমিক অবস্থায় মহানবীর (সা)-এর প্রতি কেবল ইসলামী দাওয়াত পৌছানোর আদেশ

ছিল, জিহাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হয়নি। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে তিনি যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং সেখানে ইসলামের দুশ্মনেরা তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল তখন আল্লাহত্তা'য়ালা মহানবী (সা) ও সাহাবীদেরকে জিহাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দান করলেন।

খ. হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম (রহ)-এর যাদুল মা'আদ হতে জানা যায়, এইভাবে প্রায় তের বছরকাল পর্যন্ত তিনি প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনে আল্লাহত্তীতি সৃষ্টির প্রয়াস পান। এই সময় তিনি কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি এবং কাউকে জিয়িয়া দিতেও বলেননি। বরং ত্রি সময় হাত গুটিয়ে রাখা, ধৈর্য ধারণ করা এবং সহনশীলতার পথ অবলম্বন করার জন্যই তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর তিনি হিজরতের নির্দেশ লাভ করেন। হিজরতের পর সশন্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে অন্তর্ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ (যুদ্ধ) করার এবং যারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে তাদের ওপর হস্তাক্ষেপ না করা নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণরূপে বাস্তুবায়িত না হওয়া পর্যন্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়।

৬.৩ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

গণতন্ত্র হচ্ছে মানবরচিত (of the people, by the people) আইনের শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদে বসে আইন বানায়। এই শাসন ব্যবস্থায় স্বার্বভৌমত্ব দেশের জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ইসলামী শাসনের অনুপস্থিতির কারণে বর্তমানে বাংলাদেশসহ প্রতিটি মুসলিম দেশই দারুল কুফর। এখন প্রশ্ন হলো, কুফর আইন ও শাসন ব্যবস্থার অধীনে কোনো মুসলিমের জন্য কি নির্বাচনে অংশ নেয়া জায়েজ হবে?

কাউকে ভোট দেয়া মানে তার আদর্শ ও মতামতকে সমর্থন জানানো। ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের মতো সুস্পষ্ট কুফরী আদর্শকে কি কোনো মুসলিম সমর্থন জানাতে পারে? আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের আইন বানানোর ক্ষমতা কীভাবে একজন মুসলিম সমর্থন করতে পারে? আল্লাহর পরিবর্তে জনগণের স্বার্বভৌমত্ব কোনো মুসলিম কীভাবে মেনে নেবে? ধর্ম থেকে রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করাটা কোনো মুসলিম কি মানতে পারে? যেখানে ইসলামে রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা নিয়ে অসংখ্য আইন-কানুন আছে, সেখানে একজন মুসলিম কি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হয়ে রাষ্ট্র থেকে ইসলামের বিচ্ছিন্নতা মেনে নেবে? সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, ধর্মনিরপেক্ষ

কিংবা গণতান্ত্রিক আইন ও শাসন ব্যবস্থার অধীনে কোনো মুসলিম নির্বাচনে অংশ নেয়াটা জায়েজ হবে না।

গণতান্ত্রিক সংবিধান ও শাসন ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনে অংশ নেয়া মানে ওই কুফরী ব্যবস্থাকে সহায়তা ও শক্তিশালী করা। অথচ আল্লাহর আদেশ:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

সৎকাজ ও তাকওয়ায় পরম্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যকে সাহায্য করবে না। [সূরা মায়দা: ২]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, যারা কথা ও কাজ দিয়ে মানবরচিত শাসনকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আল্লাহর আইনের শাসন যাদের উদ্দেশ্য নয়, সেসব জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি কোনো অবস্থাতেই ভোট দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে সাহায্য করা যাবে না।

আবার কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, গণতন্ত্র হারাম হলেও তথাকথিত বৃহত্তর স্বার্থ বা লাভ-এর জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশ নেয়া যাবে; এই ব্যবস্থার অধীনে ক্ষমতায় গিয়ে পরে এই ব্যবস্থাটিকে পাল্টে দিলেই হলো!

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথমত, এরূপ দ্বিমুখী নীতি ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোনো ইসলামী দল বা ব্যক্তি এভাবে কোনো হারাম পদ্ধতি থেকে স্বার্থ বা লাভ হাসিল করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়াতবহির্ভূত কোনো কিছু গ্রহণ করার মধ্যে কোনো লাভ বা কল্যাণ থাকতেই পারে না। রাসূল (সা) বলেছেন,

الْخَيْرُ اتَّبَاعُ الْقُرْآنِ وَسُنْنَتِي

‘কল্যাণ’ হলো কুরআন ও আমার সুন্নাহ অনুসরণ করা। [তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর]

উসুল আল-ফিকহের প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো: ‘সেটাই ভালো যেটাকে ইসলাম ভালো বলেছে। সেটাই খারাপ যেটাকে ইসলাম খারাপ বলেছে।’

গণতন্ত্র তথা মানবরচিত আইনে কোনো কল্যাণ থাকলে আল্লাহ কুরআনে বলতেন না:

إِنْ أَخْكُمْ إِلَّا لِلَّهِ فَأَخْكُمُ لِلَّهِ أَلْعَلِيٌّ أَلْكَبِيرُ

আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। [সূরা ইউসুফ: ৪০, সুরা আনআম: ৫৭]

فَأَخْكُمُ لِلَّهِ أَلْعَلِيٌّ أَلْكَبِيرُ

আইন দেয়ার ক্ষমতা সর্বোচ্চ মহান আল্লাহর। [সূরা মুমিন: ১২]

বস্তুত এটি ইসলামের সুস্পষ্ট আকৃতি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইনপ্রণয়ণের ক্ষমতা নেই। আল্লাহর ঘোষণা:

وَمَنْ مُّمْبَحِّكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে যারা শাসন করে তারাই কাফের। [সূরা মায়দা: ৪৪]

এই আয়াতের তাফসীরে হ্যরত ইবন আবুস (রা) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি শরীয়াতভুক্ত আল্লাহর কোনো একটি নিশ্চিত হৃকুমকে অস্বীকার করে, তাহলে সে ব্যক্তি কাফের। ইবনে জরীর আত-তাবারী বলেন, এই বিষয়ে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

ইবন আবুস (রা) আরো বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সে ব্যক্তি কাফের। যে ব্যক্তি বলে যে, মানুষের আইন আল্লাহর আইনের চেয়ে ভালো, সে কাফের। যে ব্যক্তি বলে যে, মানুষের আইন আল্লাহর আইনের মতোই ভালো, সেও কাফের। যে ব্যক্তি আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে না, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেটা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়েও শাসন করা যায়, সেই ব্যক্তিও কাফের। কেননা সে অস্বীকার করছে যে, আইন দেয়ার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর। এমন কি, সেই ব্যক্তি যদি এটাও বলে যে, সে যেটা প্রয়োগ করছে সেটার চেয়ে আল্লাহর আইন শ্রেষ্ঠ, তবুও সে কাফের। তবে কোনো ব্যক্তি যদি কুফর দিয়ে শাসন করে কিন্তু তাতে বিশ্বাস করে না, বরং সেটাকে ঘূণা করে এবং এটাও বিশ্বাস করে যে, সে যেটা করছে সেটা একটা কবীরা গুনাহ, তাহলে সেটা কুফর-দুন-কুফর (কুফরীর চেয়ে ছোট কুফরী) অর্থাৎ সে ব্যক্তি কাফের নয়, কিন্তু সে নিশ্চিতভাবেই হারাম কাজ করছে।

ইবনে কাসীর (রহ) তার তাফসীর গ্রন্থে সূরা নিসার ১৫১নং আয়াতের তাফসীরে তাতারদের প্রসঙ্গে বলেন, তারা ইহুদী, খ্রীস্টান ও ইসলামের আইনের সমন্বয়ে একটি সংকলন তৈরী করলো। সেই সংকলনে তাদের নিজেদের মতামত ও ইচ্ছার ভিত্তিতে

তৈরী অনেক আইনও স্থান পেল। পরবর্তীকালে জনগণ ওই আইন-সংকলনটিই অনুসরণ করতে লাগলো এবং একে কুরআন-সুন্নাহর উপরে প্রাধান্য দেয়া হলো। যে শাসক এমনটা করলো, সে কাফের।

শাহখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ) বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে না যে, আলাহ যা অবর্তী করেছেন তা দিয়ে শাসন করাটা ফরয, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। যে ব্যক্তি মনে করে যে, তার নিজের মতামত দিয়ে জনগণকে শাসন করা বৈধ এবং আল্লাহর আইন থেকে সরে যায় ও অনুসরণ করে না, সে ব্যক্তিও কাফের। সুতরাং সমগ্র উম্মাহর জন্য সাধারণ নিয়ম হলো, কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে শাসন করা বা রায় দেয়া বৈধ নয়। কোনো জ্ঞানী বা নেতা বা শায়খ বা রাজার আদেশ মানতে জনগণকে বাধ্য করানোর অধিকার কোনো ব্যক্তিরই নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, সে ওইরূপ কোনো কিছু দিয়ে মানুষের বিচার করতে পারবে এবং কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে বিচার করে না, সে ব্যক্তি কাফের। [মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩০-১৩২]

উপরিউক্ত মতামতসমূহ থেকে পরিষ্কার যে, কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে আইনপ্রণয়ন করা বা শাসন করা সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট দিয়ে মানুষকে সংসদে বসে আইন বানানোর ক্ষমতা দেয়াটা সুস্পষ্ট হারাম। এক্ষেত্রে কোনো রকম লাভ/স্বার্থ ইত্যাদির ভাগ করা ইসলামী আকৃদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইমাম শাতিবী (রহ) বলেন, শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিকে স্বীয় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর সত্যিকারের দাসে পরিণত করা আর এটাই একমাত্র বৈধ লাভ/স্বার্থ [মাসলাহা]। [মুওয়াফাকাত]

৬.৩.১ নির্বাচন ও গণতন্ত্র এক কথা নয়

এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনে অংশ নেয়া হারাম হলেও, নির্বাচন কেবল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই একক সম্পত্তি নয়। অন্য যে কোনো শাসন ব্যবস্থার অধীনেও নির্বাচন হতে পারে। যেমন: রাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও নির্বাচন হয়। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনেও নির্বাচন হতে পারে। রাসূল (সা) আকাবার বায়’আতের সময় আউস ও খাজরায়ের বারটি গোত্র থেকে বারজন নাকীব (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করতে আদেশ দিয়েছিলেন। ওই বারটি গোত্র রাসূল (সা)-কে সবার পক্ষ থেকে নুসরাহ ও আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। সুতরাং মুসলিমদের নেতা তথা খলীফা নিয়োগ করার ক্ষেত্রে নির্বাচনকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ। তৃতীয় খলীফা হিসেবে উসমান (রা)-কে নিয়োগের সময় খলীফা নিয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবী আবুদুর রহমান বিন আউফ (রা) সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের ভিত্তিতেই উসমান (রা)-কে বেছে নিয়েছিলেন।

অর্থাৎ মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন/ভোটাভ্রতি তখনই বৈধ, যখন সেটা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশ নেয়া হারাম, কেননা ওই শাসন ব্যবস্থাসমূহ কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী।

৬.৩.২ সংসদ (Parliament) ও মজলিসে শুরা এক বিষয় নয়

কেউ কেউ পজিবাদী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পার্লামেন্টের সঙ্গে খিলাফত ব্যবস্থার মজলিসে শুরাকে গুলিয়ে ফেলেন। এরা মনে করে, পার্লামেন্ট ও মজলিসে শুরা একই দায়িত্ব পালন করে, তাই গণতন্ত্র ও খিলাফতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

অথচ প্রকৃত সত্য হলো, পার্লামেন্ট (Parliament) বলতে আইন সভাকে বুঝায় (বাংলা একাডেমীর ডিকশনারি দ্রষ্টব্য)। আর মজলিসে শুরা বলতে বুঝায় পরামর্শ সভাকে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের কাজ হলো, সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে আইন বানানো। অন্যদিকে, খিলাফত শাসন ব্যবস্থায় মজলিসে শুরার কাজ হলো আল্লাহর নির্দেশিত আইনের মাধ্যমে খলীফাকে পরামর্শ দেয়া। শুরা সদস্যরা আইন প্রণয়ন করেন না।

আবার সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী পার্লামেন্ট যেকোনো বিষয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু মজলিসে শুরা কেবলমাত্র মুবাহ বিষয়সমূহে খলীফাকে পরামর্শ দিতে পারে, ফরয-ওয়াজিব-হারাম-হালাল ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার ক্ষমতা মজলিসে শুরার নেই। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা প্রণীত আইন মানতে গণতান্ত্রিক শাসক বাধ্য থাকেন। কিন্তু শুরা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের পরামর্শ মানতে খলীফা সর্বাবস্থায় বাধ্য নন, বরং খলীফা চাইলে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের মাধ্যমে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্তে নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, খলীফা আবু বকর (রা) অধিকাংশ সাহাবীর পরামর্শ গ্রহণ না করে উসামা বিন যাইদ (রা)-কে রোম সীমান্তের যোদ্ধাদলের সেনানায়ক হিসেবে প্রেরণ করেন।

পার্লামেন্ট গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। পার্লামেন্ট না থাকলে গণতন্ত্রও নেই। কিন্তু মজলিসে শুরা খিলাফত শাসন অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ নয়। শায়খ তাকিউদ্দিন আন-নাবাহানী (রহ) বলেন,

... أَنَّهُ مِنْ أَجْهِرِ الْحُكْمِ وَلَيْسَ مِنْ قَواعِدِهِ، فَالشُّورَى حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الرُّعْيَةِ عَلَى الرَّاعِي، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهَا يَكُونُ قَدْ قَصَرَ، وَلَكِنَّ الْحُكْمَ يَبْقَى حُكْمًا إِسْلَامِيًّا. وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّورَى هِيَ لِأَخْذِ الرَّأْيِ وَلَيْسَتْ لِلْحُكْمِ، بِخَلَافِهَا فِي مُحَالَسِ النُّوَابِ الْدِيمُقْرَاطِيَّةِ

এটি (মজলিসে শুরা) শাসন কাঠামোর একটি অংশ মাত্র, প্রধান কোনো স্ন্ত নয়। শুরা হচ্ছে খলীফার উপর জনগণের অধিকার। কাজেই তিনি এ ব্যপারে অবহেলা করলে তিনি অবহেলাকারী হবেন, কিন্তু তারপরও শাসন ব্যবস্থাটি থাকবে ইসলামী। কারণ ইসলামে শুরার প্রয়োজন মতামত গ্রহণের জন্য, শাসনের জন্য নয়। এটি প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সংসদীয় পদ্ধতির বিপরীত।

৬.৪ Secularism/ ধর্মনিরপেক্ষতা

Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদটিকে কেউ কেউ সকল ধর্মের সমান স্বাধীনতা বা সবাই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে - এই অর্থে বোঝাতে চান। প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজম মানে হলো ধর্মীয় আইন-কানুন থেকে রাষ্ট্র আলাদা থাকবে। Oxford Dictionary-তে সেকুলারিজমকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: The belief that religion should not be involved in the organisation of society, education, etc. [সমাজের গঠন/সংগঠন, শিক্ষা ইত্যাদিতে ধর্ম যুক্ত হবে না - এই বিশ্বাসের নাম সেকুলারিজম।]

Encarta Dictionary-তে সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে: **Exclusion of religion from public affairs:** the belief that religion & religious bodies should have no part in political or civic affair or in running public institutions, especially schools etc. [সরকারি কাজকর্ম থেকে ধর্মের বিচ্ছিন্নতা: রাজনীতি বা নাগরিক কার্যকলাপ বা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষত স্কুল ইত্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অংশ নিতে পারবে না - এই বিশ্বাসের নাম সেকুলারিজম।]

কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের বিচ্ছিন্নতা কোনো মুসলিম মেনে নিতে পারে না:

يَأَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي الْسَّلِيمِ كَافَّةً

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। [সূরা বাকারা: ২০৮]

ইবন কাসীর (রহ) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন, ইবন আবাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন,

ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئاً

তোমরা পরিপূর্ণভাবে মুহাম্মদ (সা)-এর দীনের সমস্ত আইনের আনুগত্য কর এবং সেখান থেকে কোনো কিছুই পরিত্যাগ করো না।

এই আয়াতের তাফসীর মুফতি শাফী (রহ) বলেন, কোরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও এবাদতের সঙ্গেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সঙ্গেই হোক অথবা রাজনীতির সঙ্গেই হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সঙ্গেই হোক কিংবা শিল্পের সঙ্গে - ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা সবাই তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। [মা'আরেফুল কুরআন]

যারা ইসলামের বিধি-বিধানসমূহকে আংশিকভাবে পালন করতে চায় তাদেরকে আল্লাহ কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এই বলে যে,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ
إِلَّا خَرْزٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন এরা কঠিন শাস্তির দিকে নিষ্কিপ্ত হবে। [সূরা বাকারা : ৮৫]

৬.৫ জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ বলতে নির্দিষ্ট কোনো ভাষা, অঞ্চল, জনগোষ্ঠী, গোত্র, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের রাজনৈতিক চিন্মাতাকে বোঝায়। এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় বলা হয়েছে, Nationalism is a sense of shared identity and loyalty, based upon common history, language, culture, and traditions. [জাতীয়তাবাদ হলো একই ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামষিক পরিচয় ও আনুগত্যের অনুভূতি।]

কিন্তু ভাষা, অঞ্চল, জনগোষ্ঠী, গোত্র, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার চিন্তা (আসাবিয়াহ) ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبَيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قاتَلَ عَلَى عَصَبَيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبَيَّةٍ

যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের দিকে ডাকে, নিজেও আসাবিয়াতের সমর্থনে যুদ্ধ করে এবং আসাবিয়াতের সমর্থনে মৃত্যুবরণ করে, সে আমাদের মধ্য হতে নয়। [আবু দাউদ]

রাসূল (সা) বলেছেন:

وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَأْيَةٍ عِمْيَةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَيَّةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَيَّةً فَقُتِلَ فَقْتَلَةً جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি একটি অঙ্গ পতাকার অধীনে যুদ্ধ করে, তার স্বজাতির সঙ্গে ক্ষুণ্ণ হয়, অথবা স্বজাতিকে আহ্বান করে, অথবা স্বজাতিকে সাহায্য করে এবং সে কারণেই নিহত হয়, তাহলে সে নিহত হলো জাহিলিয়াতের মধ্যে। [মুসলিম]

সুতরাং ইসলামে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের কোনো ভিত্তি নেই।

৬.৬ নারী নেতৃত্ব

ইমাম বুখারী (রহ) বর্ণনা করেন, পারস্যবাসী কর্তৃক কিসরার কন্যাকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানোর খবর শুনে রাসূল (সা) বলেন:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأً

সেই জাতি কখনো সফল হবে না যারা শাসন ক্ষমতা নারীর হাতে অর্পণ করেছে।

কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ) এই হাদীস সম্বন্ধে বলেন:

هذا نصٌ في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه

‘নারী যে খলীফা হতে পারবে না, উপরিউক্ত হাদীস তার বলিষ্ঠ প্রমাণ - এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।’ [তাফসীরে কুরতুবী, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩]

ইমাম ইবনে হায়ম (রহ) বলেন:

وَجْمِيعُ فَرَقِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لِيُسْ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَجِيزُ إِمَامَةً امْرَأَةً

‘কিবলার অনুসারী (মুসলিম)-দের বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে কেউ এমন নেই যে নারী নেতৃত্বকে জায়েজ মনে করে।’ [আল ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়ায়ী ওয়ান নাহল]

শায়খ আবদুল কাদীম জাল্লুম (রহ) উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

‘যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) যারা নারীদেরকে শাসকের দায়িত্ব দেবে তাদের অসফলতার কথা বলেছেন, সুতরাং এটি নিষেধাজ্ঞার ইঙ্গিতবাহী। ...এখানে প্রদত্ত ইঙ্গিতটি চূড়ান্ত। ...অতএব, নারীকে (শাসক হিসেবে) নিয়োগ দেয়া হারাম।’ [নিয়ামুল হকুম ফিল ইসলাম]

৬.৭ জরুরত:

জরুরত বা প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে কেউ কেউ শরীয়াতের বিধান লজ্জনকে জায়েজ বানানোর চেষ্টা করেন। এরা দাবি করে যে, যেহেতু আল্লাহ মরণাপন্ন ক্ষুধার সময় হালাল খাদ্য না থাকলে শুকর বা অন্যান্য হারাম খাদ্য খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর অনুমতি দিয়েছেন, সেহেতু প্রয়োজনের তাগিদে নারী নেতৃত্ব, গণতন্ত্র, মার্কিন-বৃটিশ তথা কুফর শক্তির ত্বাবেদারি করাও জায়েয। তারা আরো মনে করেন যে, প্রয়োজন বা জরুরতের তাগিদে যে কোনো হারাম কাজ করা যাবে। [নাউয়ুবিল্লাহ]

প্রকৃতপক্ষে এরা পবিত্র কুরআনের আয়াতকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করছে। কুরআন যেটাকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনুমতি দিয়েছে, এরা সেটাকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করছে। এটা সত্য যে, আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিচয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর হারাম করে দিয়েছেন মৃত পশু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই হয় এমন পশু। কিন্তু যে অবাধ্য বা

সীমালজ্জনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হয়ে পড়ে তার কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ
ক্ষমাশীল, দয়াময়। [সূরা বাকারা: ১৭৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই নিরূপায়, হারাম খাদ্য না খেলে মৃত্যুবরণ করবে,
কেবল তার ক্ষেত্রে হারাম খাদ্যগ্রহণের অনুমতি আছে। এই আয়াতের বর্ণিত জরুরত বা
প্রয়োজনের ব্যাপারে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের তাফসীর থেকে একথাই বোঝা যায়।

হানাফী মাযহাবের আলেম ইমাম আল রাজী (রহ) বলেন, এখানে জরুরত বলতে
বোঝায়, হারাম খাদ্য গ্রহণ না করলে প্রাণহানী বা অঙ্গহানীর সম্ভাবনাকে। [আহকামুল
কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯]

হাস্বলী মাযহাবের আলেম ইমাম ইবনে কুদামাহ (রহ) বলেন, জরুরত বলতে এমন
পরিস্থিতিতে বোঝায় যখন এটা প্রতিষ্ঠিত যে, [হারাম] খাদ্য গ্রহণ না করলে ক্ষুধায়
প্রাণহানী ঘটবে। [আল মুগন্নী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০১]

শাফেই মাযহাবের আলেম ইমাম গাযালী (রহ) বলেন, জরুরত বলতে আমরা এমন
অবস্থাকে বুঝি যেটা কোনো ব্যক্তিকে ধ্বংস করে ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি খাদ্য
গ্রহণ না করে তাহলে সে এমন অসুস্থ হবে যে তার মৃত্যু ঘটবে। [ওয়াসিত, ৭ম খণ্ড,
পৃষ্ঠা ১৬৮]

মালিকী মাযহাবের আলেম ইমাম ইবনে জাওয়ী (রহ) বলেন, জরুরত বলতে মৃত্যুর
ভয়কে বোঝায়। [আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া, পৃষ্ঠা ১১৬]

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মুফতি মুহাম্মদ শাফী (রহ) বলেন, এক্ষেত্রে
কোরআন করীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি;
বলেছে ‘তার কোনো পাপ হবে না।’ এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি
হারামই রয়ে গেছে কিন্তু যে খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য
গ্রহণের পাপ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। [তাফসীরে মা’আরেফুল কুরআন]

সুতরাং নিরূপায় ব্যক্তির মরণাপন্ন পরিস্থিতি মাসআলা ব্যবহার করে নিতান্ত স্বাভাবিক
পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে শরীয়াতকে পাশ কাটিয়ে নারী নেতৃত্ব,
গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র ইত্যাদিকে মেনে নেয়ার কোনো সুযোগ
আল্লাহ পরিত্র কুরআনে দেননি। বরং কুরআন-সুন্নাহতে আমরা দেখতে পাই কঠিন ও
দুর্বিষহ পরিস্থিতিতেও শরীয়াতের আনুগত্য করার শিক্ষা। যেমন, আল্লাহ বলেন:

وَلَنْبُلَوْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَلْخَوْفِ وَأَلْجُوعِ وَنَفْصِ مِنْ أَلْمَوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَّرَ الْصَّابِرِينَ

আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন, প্রাণের ক্ষতি ও ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্ঘশীলদের। [সূরা বাকারা: ১৫৫]

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَاعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ
يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَيْغُرُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا

রাসূল (সা) বলেছেন: অঙ্ককার রাতের ন্যায় ফিতনা আসার আগেই দ্রুত সৎকর্ম সেরে ফেল। সেসময় একজন ব্যক্তি সকালে মুসলিম ও সন্ধ্যায় কাফের বা সন্ধ্যায় মুমিন ও সকালে কাফের হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার সামগ্রীর জন্য সে তার দ্বীনকে বিক্রি করে দেবে। [মুসলিম, কিতাবুল সৈমান, ২১৩]

৬.৮ হৃদায়বিয়ার সন্ধি

কেউ কেউ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে জায়েজ করার জন্য হৃদায়বিয়ার সন্ধির দোহাই দেন। প্রথমত, হৃদায়বিয়ার সন্ধি একটি পররাষ্ট্র চুক্তি, যেটি মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল। এটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো মাধ্যম ছিল না। দ্বিতীয়ত, হৃদায়বিয়ার সন্ধিতে কোনো হারাম শর্ত থাকার প্রশ্নই উঠে না, কেননা সন্ধিটি আল্লাহ সুবাহানাহু তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়েছিল। তাই গণতন্ত্র বা নারী নেতৃত্বের মতো কুফরী বিষয়ের সঙ্গে সেই মহান চুক্তির কোনো তুলনা হতে পারে না।

সুতরাং যেসব চুক্তি/জোট দ্বারা গণতন্ত্র, নারী নেতৃত্বকে বৈধতা দেয়া হয়, জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় বসানো হয়, সেসব চুক্তি/জোট শরীয়াতের অকাট্য দলিল দ্বারা নিশ্চিতভাবে হারাম। কতিপয় মুফাস্সির, শায়খ, আল্লামা, মুফতি, মাওলানা দ্বারা এসব চুক্তি বা জোট গঠিত হলেই তা বৈধ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَامًا أَوْ أَحْلَالَ حَرَامًا

মুসলিমদের মধ্যে চুক্তি বৈধ - যদি চুক্তিতে এমন শর্ত না থাকে, যা হালালকে হারাম করে বা হারামকে হালাল করে। [তিরমিয়ি]

৬.৯ মন্দের ভালো

দুটো মন্দের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম মন্দ অর্থাৎ যেটি মন্দের ভালো সেটি গ্রহণ করা যাবে - এই অস্ত্রুত যুক্তি দেখিয়ে আমাদের দেশে কেউ কেউ জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে জোট গড়েছেন, সমর্থন দিয়েছেন, ক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন। এই একই যুক্তি দেখিয়ে কেউ ভিড়েছেন ধর্মনিরপেক্ষ নারী নেতৃত্বের সঙ্গে, কেউ ভিড়েছেন জাতীয়তাবাদী নারী নেতৃত্বের সঙ্গে। প্রত্যেকের কাছে তাদের নিজ নিজ পক্ষের কুফর দলটি মন্দের ভালো!

কিন্তু ‘মন্দের ভালোকে গ্রহণ করা যাবে’ - এটি একটি মনগড়া নীতি ছাড়া কিছু নয়। ইসলামের সঙ্গে এর ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَسْتَوِيْ أَحْسَنَةُ وَلَا أَلْسَيْئَةُ أَدْفَعْ بِالْأَيْتِيْ هِيَ أَحْسَنُ

আর ভালো ও মন্দ কখনো সমান নয়। মন্দকে ভালো দিয়ে আঘাত কর ...। [সূরা হামাম আস-সিজদাহ: ৩৪]

সুতরাং মন্দ সবসময়ই মন্দ। কোনো মন্দই গ্রহণ করা যায় না। পরিণতি ও ভয়াবহতার বিচারে কোনোটি কম মন্দ বা কোনোটি বেশি মন্দ হতে পারে। তবে সবধরনের মন্দ থেকেই দূরে থাকা হলো ইসলামের শিক্ষা। যেমন, হাদীসে গীবতকে ব্যভিচার থেকে মন্দ বলা হয়েছে:

الغِيْبَةُ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرُّنْقَى

আল্লাহ আজ্ঞাওয়াজাল-এর নিকট গীবত জেনার চাইতেও মন্দ। [বাযহাকী]

তাই বলে কেউ যদি গীবতকে বেশি মন্দ ভেবে কেবল সেটি থেকে দূরে থাকেন, আর ব্যভিচারকে কম মন্দ ভেবে ব্যভিচারে লিঙ্গ থাকেন, তাহলে এই ব্যক্তির ফাসেকী সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকবে কি?

একইভাবে, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস শরীফে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারকে বড় গুনাহ বলা হয়েছে। তাই বলে কেউ যদি প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারকে বেশি মন্দ ভেবে সেটা থেকে বিরত থাকেন, আর দূরবর্তী কোনো নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিঙ্গ হন, তাকে আমাদের দেশের ওইসব শায়খ, মুফতি, মাওলানারা কি ‘পাপী’ ছাড়া আর কিছু বলতে পারবেন?

৬.১০ নিয়ত

‘নিশ্চয়ই কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল’ – হাদীসের এই মহান বাণীর প্রকৃত তাৎপর্যকে বিকৃত করে কিছু লোক দাবি করে যে, খারাপ কাজ ভালো নিয়ত নিয়ে করলে সমস্যা নেই। এই বিখ্যাত হাদীসটি নিয়ে এধরনের বিভাসি একেবারেই ইদানিং কালের। অতীতে কেউ এই হাদীসটি নিয়ে বিভাসিকর কথা বলেননি। কেননা এই হাদীসের পুরো রেওয়ায়াতটি পড়লেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি অসৎকাজের নিয়তসংক্রান্ত কোনো হাদীস নয়। বরং এটি সৎকাজের নিয়তসংক্রান্ত হাদীস। পুরো রেওয়ায়াতটি হলো:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا
هَا جَرَ إِلَيْهِ

নিয়তের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে হিজরত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে, তার হিজরত পরিগণিত হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে। আর যে হিজরত করে দুনিয়া লাভ করা বা কোনো নারীকে বিবাহ করার নিয়তে, তার হিজরত হয় তার দিকেই, যার নিয়তে সে হিজরত করেছে। [বুখারী, মুসলিম]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ভালো কাজও অবশ্যই ভালো নিয়তে করতে হবে। খারাপ নিয়তে করলে ভালো কাজেরও সওয়াব পাওয়া যাবে না। আর খারাপ কাজের ভালো নিয়ত বা মন্দ নিয়ত সম্বন্ধে এই হাদীস কিছুই বলা হয়নি।

সাম্প্রতিককালের কিছু লোকের এই বিভাসির জবাব দিয়েছেন বাংলাদেশের সুখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুর রহীম। তিনি উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: ‘যে কাজ মূলত খারাপ, যে কাজ আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে ভালো নিয়তের তো কোনো প্রশংসন হইতে পারে না। কারণ তাহা তো মূলত খারাপ এবং পাপের কাজ। এমতাবস্থায় উহার সহিত সৎ উদ্দেশ্য যোগ করা এবং তাহা হইতে সওয়াবের আশা করাই বরং অধিকতর অন্যায় ও পাপের কাজ। কেননা এইরূপ করিলে তাহাতে আল্লাহর দ্বিনের সহিত তামাশা ও বিদ্রূপ করা হয়।’ [হাদীস শরীফ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩, খায়রুন প্রকাশনী]

৬.১১ অন্঱রের ঘৃণাই যথেষ্ট

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তার হাত দ্বারা তা পরিবর্তন করে। তার এই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা করে। তার এই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন তার অন্঱র দ্বারা তা করে (ঘৃণার মাধ্যমে), আর এটা হলো দুর্বলতম ঈমান। [মুসলিম, তিরমিয়ি]

এই হাদীসের ভিত্তিতে কোনো কোনো দল দাবি করে, বর্তমান যুগে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই, কেবল অন্যায়ের প্রতি অন্঱রের ঘৃণাই যথেষ্ট। কিন্তু এই হাদীসে অন্঱রের ঘৃণাকে ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা বলা হয়েছে। তাই এই অবস্থান কোনো মুমিনের কাম্য হতে পারে না।

তাছাড়া এই হাদীসটি ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম বর্ণনা করছে, দলের কথা বলছে না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিতান্ত অপারগ অবস্থায় মুনক্কারকে কেবল অন্তর থেকে ঘৃণা করলেও দুর্বলতম মুমিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু দলের ক্ষেত্রে এই হাদীসের কথা তোলা অপ্রাসঙ্গিক। দলকে সবসময়ই সুরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতের হুকুম মোতাবেক সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে হবে এবং সেটা মনে মনে করার মতো কোনো কাজ নয়।

৬.১২ হিকমত

কেউ কেউ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে জায়েজ করার জন্য হিকমতের কথা বলেন।

‘হিকমত’ শব্দটি আরবি ‘হাকামা’ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো শাসন করা বা রায় দেয়া। এই শব্দটি কুরআনে বিশ্বার ব্যবহার হয়েছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: নবুয়ত, কুরআন, সুন্নাহ, বাস্বজ্ঞান এবং বাস্বজ্ঞানের আলোকে কাজ করা।

বিভিন্ন আয়াতে ‘হিকমত’ শব্দের কিছু প্রয়োগ নিম্নরূপ:

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে রব, তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। [সূরা বাকারা: ১২৯]

এই আয়াতে ‘হিকমত’ শব্দের অর্থ হলো ওহীর তিলাওয়াত ও সুন্নাহ দ্বারা রাসূল (সা) কর্তৃক প্রদত্ত ওহীর ব্যাখ্যা।

يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ
إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয়, সে অভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উপদেশ শুধু তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। [সূরা বাকারা: ২৬৯]

এই আয়াতে ‘হিকমত’ শব্দের অর্থ হলো কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ও বোধগম্যতা এবং বিশুদ্ধ ও সঠিক পদ্ধতিতে কথা ও কাজ করার সক্ষমতা। ইবনে আবুবাসের মতে, এই আয়াতে হিকমত শব্দের অর্থ কোরআনের জ্ঞান। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ

আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ [কুরআন] পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। [আলে-ইমরান: ১৬৪]

এই আয়াতে ‘হিকমত’ শব্দের অর্থ হলো সুন্নাহ।

রাজনীতি বা দাওয়ার ক্ষেত্রে ‘হিকমত’ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে যে আয়াতে সেখানে নির্দেশ হলো:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَجَادِهِمْ بِالْتَّقْوَةِ هِيَ أَحْسَنُ

আপনার পালনকর্তার পথের দিকে আহবান করুন হিকমত সহকারে ও উপদেশ শুনিয়ে উন্নতমরূপে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পছায়। [সূরা নাহল: ১২৫]

এই আয়াতে হিকমতের অর্থ কোনো কোনো তাফসিরবিদ কুরআন, কেউ কেউ কুরআন-সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। [তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১২]

রংহল মা'আনিতে আল্লামা আলুসী (রহ) আল-বাহরুল মুহীতের সূত্রে বলেছেন:

أَنَّهَا الْكَلَامُ الصَّوَابُ الْوَاقِعُ مِنَ النَّفْسِ أَجْمَعُ مَوْقِعٍ

এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয় যা মানুষের মনে আসন করে নেয়।

সুতরাং দেখা যায়, পবিত্র কুরআনে ‘হিকমত’ শব্দটি বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হলেও প্রতিটি অর্থই কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। উপরিউক্ত কোনো একটি আয়াতেও ‘হিকমত’ শব্দটি কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত কাজের লাইসেন্স অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং যেসব কাজের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহতে অকাট্য প্রমাণ আছে, সেসব কাজ করার মধ্যেই হিকমত নিহিত। আর যেসব কাজ হারাম হওয়ার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহতে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, সেসব কাজ বর্জন করার মধ্যে হিকমত নিহিত। তাই কুরআন-সুন্নাহতে অকাট্যভাবে হারাম প্রমাণিত কোনো কাজ বা মতবাদ গ্রহণ করার মধ্যে হিকমত থাকার প্রশ্নই ওঠে না। যারা ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের মতো কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা অকাট্যভাবে হারাম প্রমাণিত মতবাদের মধ্যে হিকমত খোঁজেন কিংবা যারা ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী শক্তি বা নারী নেতৃত্বের সাথে জোট করার জন্য হিকমতের দোহাই দেন, তারা সুসম্পর্কভাবে ভুল পথে আছেন।

রাসূল (সা) বলেছেন:

বনী ইসরাইল (আহলে কিতাবীরা/ইহুদী-খ্রীস্টানরা) বাহাতুরটি ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত তিহাতুরটি ফিরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে এই জামা'আত ছাড়া বাকি সবাই জাহানামে যাবে। [আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, হাকিম]

তিরমিয়ির অপর বর্ণনা হতে জানা যায়, এই জামা'আত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতির উপর যারা রয়েছেন তারা।

এই সম্মানিত হাদীসে বর্ণিত ‘ফিরকা’ শব্দটি নিয়ে অনেকে বিভান্ন হয় আছেন। ‘ফিরকা’-কে এরা মাযহাব, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি নানা অর্থে বুঝে থাকেন। তাই ‘ফিরকা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝা খুবই প্রয়োজন।

আরবি ভাষায় ‘ফিরকা’ শব্দটি ‘লাফ্জ মুশতারাক’ অর্থাৎ বহু ধরনের অর্থ প্রকাশকারী শব্দ। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ‘ফিরকা’ শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহার করেছেন। যেমন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আর সমস্ত মুমিনের একত্রে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ (ফিরকা) কেন বের হলো না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে? [সূরা তওবা: ১২২]

এই আয়াতে ‘ফিরকা’ অর্থ দলের অংশবিশেষ।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

নিচ্যই তাদের মধ্যে এক দল (ফিরকা) রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ

তা আদৌ কিতাব হতে নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। [সূরা আলে-ইমরান: ৭৮]

এই আয়াতে ‘ফিরকা’ নিন্দাসূচক অর্থে দল-কে বুঝিয়েছে, কেননা ওই দলটি ওহীকে বিকৃত করতো।

সুতরাং ‘ফিরকা’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ বোঝার জন্য শব্দটি কোন প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটির দিকে লক্ষ রাখা জরুরি। উপরে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইহুদীরা একাত্তরটি ও খ্রীস্টানরা বাহাত্তরটি ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর তিনি জানান, এই উম্মতও তিয়াত্তরটি ফিরকায় বিভক্ত হবে। রাসূল (সা) ও তার সাহাবাদের অনুসারী দলটি ছাড়া বাকি সবাই জাহানামে যাবে। এভাবে এই হাদীসে ইহুদী-খ্রীস্টানদের মতো করে মুসলিমদের বিভক্ত হওয়াকে নিন্দা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইহুদী-খ্রীস্টানদের এই ধরনের ফিরকার অনুসরণ করতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرْدُو كُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোনো ফিরকাকে অনুসরণ কর, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত করে দেবে। [সূরা আলে ইমরান: ১০০]

তাই হাদীসে বর্ণিত ‘ফিরকা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে ইহুদী-খ্রীস্টানরা কোন ধরনের ইস্যুতে মতভেদ করে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেটি বিবেচনায় রাখতে হবে।

পবিত্র কুরআন বারবার আমাদেরকে ইহুদী-খ্রীস্টানদের মতো মতভেদ করেতে নিষেধ করেছে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, যেসব ইস্যুতে তারা বিভক্ত হয়েছিল, সেগুলো হলো:

১. তারা নবী-রাসূলদের ব্যাপারে মতভেদ করেছিল। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرُوكُمْ فَقَرِيقًا كَذَّبُوكُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

আমি মুসাকে কিতাব প্রদান করলাম, তারপর পর্যায়ক্রমে অনেক রাসূল পাঠালাম। আর মরিয়মের পুত্র ইসাকে প্রকাশ্য প্রমাণাদি দিলাম এবং ‘রুহুল কুদুস’ (জিবারইল) দিয়ে তাঁকে সাহায্য করলাম, তবে কি যখনই কোনো রাসূল তোমাদের মনঃপুত নয় এমন বিধান নিয়ে আগমন করেছেন তখন তোমরা অহংকার করেছ, কতককে মিথ্যাবাদী বলেছ, আর কতককে হত্যা করেছ। [সূরা বাকারাঃ ৮৭]

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ... وَلَكِنْ أَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ..

আর মরিয়মের পুত্র ইসাকে প্রকাশ্য প্রমাণ দান করেছি... কিন্তু তারা মতভেদ করলো, ফলে কেউ ঈমান আনলো, কেউ কুফরী করলো... ... [সূরা বাকারাঃ ২৫৩]

২. তারা আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে মতভেদ করেছে:

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

... এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিঙ্গ হয়েছে, শুধুমাত্র পরম্পর বিদ্বেষবশত। কেউ আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণে তৎপর। [সূরা আলে ইমরান: ১৯]

৩. তারা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে একে অপরকে ‘কাফির’ ডাকতো:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذِلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ইহুদীরা বলে, খ্রীস্টানরা কোনো ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রীস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোনো ভিত্তির নয়। অথচ ওরা সবাই কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ, তারাও ওদের মতো উক্তি করে। অতএব, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছিল। [সূরা বাকারা: ১১৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইহুদী-খ্রীস্টানরা দ্বীনের বুনিয়াদী বিষয়গুলো নিয়ে মতভেদ করেছিল। নবী-রাসূল, কিয়ামত দিবস, আল্লাহর একত্ব, পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহানামের মতো ঈমানের ভিত্তিসমূহ নিয়ে তারা মতভেদে জড়িয়ে পড়েছিল। রাসূল (সা) আলোচ্য ‘ফিরকা’ বিষয়ক হাদীসে আমাদেরকে ইহুদী-খ্রীস্টানদের মতো মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন। এর মানে হলো, দ্বীনের ভিত্তিসমূহ নিয়ে মতভেদ করা এই হাদীস মোতাবেক নিষিদ্ধ। যেমন, পরিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। [সূরা আলে ইমরান: ১০৩]

এই আয়াতের প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন, ইহুদী-খ্রীস্টানদের মতো দ্বীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ো না এবং এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, নিজের বাসনা ও স্বার্থের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ো না। [তাফসীরে কুরতুবী]

অতএব দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে যারা মতভেদ করবে, তারাই ‘ফিরকা’। এধরনের বিষয় নিয়ে মতভেদ ইসলামে বৈধ নয়। কিন্তু দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের বাইরের শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করলে সেটা জাহানামী ফিরকা বলে গণ্য হবে না, কেননা দ্বীনের শাখা-প্রশাখামূলক বিষয়গুলোতে মতভেদ বৈধ।

ইমাম শাফী (রহ) বলেন, মতভেদ দুই ধরনের: এক ধরনের মতভেদ হারাম এবং অন্যটি হারাম নয়। যেসব বিষয়ে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নিশ্চিত প্রমাণ (হজ্জত) দিয়েছেন বা যেসব বিষয়ে রাসূল (সা) সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে জেনেশনে মতভেদ

করা হারাম। ওইসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের বাইরের বিষয়গুলোতে যেখানে ভিন্নার্থ প্রকাশ হয় বা কিয়াস করা যায়, সেক্ষেত্রে মতভেদের সুযোগ আছে। [আর রিসালাহ]

শায়খ তাকিউদ্দিন আন-নাবাহানী (রহ) বলেন,

“[আইনপ্রণেতার] বক্তব্যটি হতে পারে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত (কৃতঙ্গ উসুরুত) অর্থাৎ কোনো মতভেদের অবকাশ নেই, যথা কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীস। অথবা বক্তব্যটি হতে পারে অমীমাংসিতভাবে প্রমাণিত (জন্মিঙ্গ উসুরুত) অর্থাৎ মতভেদের অবকাশ রয়েছে, যথা অ-মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ। যদি বক্তব্যটি কৃতঙ্গ উসুরুত হয় তবে এর অর্থ নির্দিষ্ট (কৃতঙ্গ উদালালাহ) ও হ্রকুমটি চূড়ান্ত অর্থাৎ এ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। এরপ উদাহরণ হচ্ছে, ফরয সালাতের রাকাতের সংখ্যা - কারণ তা মুতাওয়াতির হাদীসে উল্লেখ রয়েছে... ...।

যদি আইনপ্রণেতার বক্তব্য কৃতঙ্গ উসুরুত অথচ একটিমাত্র নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশক না হয় (জন্মিঙ্গ উদালালাহ), তবে হ্রকুমটি অমীমাংসীত (অর্থাৎ এ নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে)। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে উল্লেখিত জিয়িয়াসংক্রান্ত আয়াতটি উল্লেখ্য। আয়াতটি কৃতঙ্গ উসুরুত কিন্তু তার অর্থ নির্দিষ্ট নয়। হানাফী মাযহাবের শর্তানুসারে, একে জিয়িয়া বলা বাধ্যতামূলক... ...। শাফেঙ্গ মাযহাবের শর্তানুযায়ী এটিকে জিয়িয়া বলা বাধ্যতামূলক নয় এবং একে দ্বৈত যাকাত বলা যায়... ...।

যদি আইনপ্রণেতার বক্তব্য জন্মিঙ্গ উসুরুত হয়, যেমন অ-মুতাওয়াতির হাদীস, তখন অর্থ কৃতঙ্গ উদালালাহ হোক বা না হোক, এ-সংক্রান্ত হ্রকুম চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হবে না, অর্থাৎ এ বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা কিংবা কৃষিভূমি ইজারা (লীজ) দেয়ার নিষিদ্ধতার বিষয়টি।” [নিয়ামুল ইসলাম]

সুতরাং হানাফী, মালিকী, শাফেঙ্গ, হাম্বলী ইত্যাদি মাযহাবগুলোকে ‘ফিরকা’ ভাবার কোনো সুযোগ নেই। মাযহাবগুলোর মতভেদ কেবল শাখা-প্রশাখায়। একইভাবে রাসূল (সা) ও সাহাবাগণের পথ অনুসরণকারী কোনো রাজনৈতিক দলকেও ‘ফিরকা’ ভাবার ন্যূনতম কোনো কারণ নেই।

তবে যারা মুহাম্মদ (সা)-কে শেষ নবী হিসেবে অস্বীকার করেছে [কাদিয়ানী], যারা হ্যরত আলী (রা)-কে আল্লাহর অংশ মনে করে [আলাওয়ি শিয়া], যারা আখিরাতের শাস্তিকে অস্বীকার করে, তারা অবশ্যই জাহানামী ‘ফিরকা’। কেননা তারা দ্বীনের সুনিশ্চিত (কৃতঙ্গ) বিষয়ে মতভেদ করেছে। কোনো দল যদি কুরআনের যে কোনো আয়াতের সুনিশ্চিত অর্থকে অস্বীকার করে, তবে তারা জাহানামী ফিরকায় পরিণত হবে। একইভাবে কোনো দল যদি কোনো সুস্পষ্ট হারামকে হালাল মনে করে তারা অবশ্যই

জাহানামী ফিরকা - তাদের আকৃতি যত বড়ই হোক না কেন। কেননা রাসূল (সা) বলেন,

سَنَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَعْظَمُهَا فِرْقَةُ قَوْمٍ يَقِيْسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ
فَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ وَيَحْلِلُونَ الْحَرَامَ

সত্ত্বরই আমার উম্মত ৭০-এরও কিছু বেশি ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে
বড় ফিরকা হবে একদল যারা বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্ত দেবে এবং
তারা হালালকে হারাম করবে ও হারামকে হালাল করবে। [হাকিম]

৬.১৪ মধ্যমপন্থা ও সমরোতা

আল্লাহ সুবহানাত্তা'আলা বলেন,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় করেছি - যাতে করে তোমরা
সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে।
[সূরা বাকারা: ১৪৩]

রাসূল (সা) বলেছেন,

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো মধ্যমপন্থা। [দাররূল মানচুর-এ ইমাম সুযুতী ইবনে আবি শাইবার
বর্ণনা হতে, শু'য়াব আল মুরসালা লিল বাযহাকী]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে অনেকে দাবি করেন আমাদেরকে মধ্যমপন্থী হতে
হবে এবং এটার জন্য প্রয়োজনে ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে আপোস সমরোতায়
যাওয়া যেতে পারে। এই যুক্তি ব্যবহার করে তারা গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র প্রভৃতি
কুফর আদর্শের সাথে মিলে মিশে গিয়েছেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আয়াত ও হাদীসে ব্যবহৃত ওয়াসাতান (وَسْطًا) শব্দের সঙ্গে আপোস সমর্থোতার কোনো সম্পর্ক নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ওয়াসাত (وَسْط) শব্দের অর্থ হলো আদল (عَدْل) বা ন্যায়পরায়ণতা। [বুখারী, তিরমিয়ি, নাসাইয়ী, ইবনে মাজাহ]

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম আতা ইবনু খলীল আবু রাশতা তার তাইসির ফী উসুলিত-তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

(الوسط) في كلام العرب الخيار و الخيار من الناس عدُون لهم

আরবদের ভাষায় الوسط শব্দের অর্থ উত্তম এবং মানুষের মধ্যে উত্তম হলো তাদের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে, ইমাম আহমদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা নুহ (আ) ডেকে জিজেস করবেন, তুমি কি বাণী পৌঁছিয়েছ? উত্তরে তিনি বলবেন, হাঁ। তখন তার সম্প্রদায়কে ডেকে জিজেস করা হবে, তোমাদের কাছে কি বাণী পৌঁছানো হয়েছে? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোনো সর্তর্করারী বা অন্য কেউ আসেনি। তখন নুহ (আ)-কে জিজেস করা হবে, তোমার সাক্ষী কে? উত্তরে তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ও তার উম্মত। রাসূল (সা) বলেন, (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) আয়াতাংশের এটাই তৎপর্য।

সুতরাং এই আয়াত ও হাদীস আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা (عَدْل) শিক্ষা দেয়। কোনো হারাম মতবাদকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার তথাকথিত সমর্থোতা বা মধ্যমপন্থা এই আয়াত ও হাদীসের শিক্ষা নয়। প্রকৃতপক্ষে এই ন্যায়পরায়ণতার কারণেই কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদিয়া অন্য উম্মতের কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।

কোনো হারাম মতবাদকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হারাম। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র প্রভৃতি কুফর ব্যবস্থার সাথে ইসলামের কোনো সমর্থোতা হতে পারে না। মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাদের সাথে সমর্থোতার প্রস্ত্রাব দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর চাচা আবু তালিবকে বলেন:

يَا عَمَّ، وَاللَّهُ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي ، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتُرُكَ هَذَا
الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ

হে চাচা, আল্লাহর শপথ, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়
এই শর্তে যে আমি আমার কাজ পরিত্যাগ করবো, তাহলেও আমি কখনো আমার কাজ
বন্ধ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ এটিকে বিজয়ী করেন অথবা আমি ধৰ্মসহ হয়ে যাই।
[সীরাতে ইবনে হিশাম]

গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, নারী নেতৃত্বের মতো সুস্পষ্ট হারাম বিষয়গুলোতে যারা ওইসব
মুফাস্সির, শায়খ, আল্লামা, মফতি, মাওলানাদের উপর নির্ভর করছেন, আল্লাহ তাদের
হিদায়াত নসীব করুন। আল্লাহ তাদেরকে সেই দলভুক্ত করুন যে দলটি সবসময় ইকের
উপর থাকবে।

ইমাম মুসলিম মুয়াবিয়া (রা)-কে উদ্ধৃত করে বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে
শুনেছি,

لَا تَرَالْ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِإِمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَّلَهُمْ أَوْ خَالَفُهُمْ حَتَّى يَأْنِي
أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ

আমার উম্মত থেকে একটি দল আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা
তাদের ত্যাগ করবে বা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে
পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর আদেশ আসে এবং তারা মানুষের উপর বিজয়ী
হয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম আহমদ তার মুসনাদে আরো উল্লেখ করেন, রাসূল (সা) বলেছেন,

لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِإِمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَّلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفُهُمْ حَتَّى
يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

আমার উম্মতের মাঝে একটি দল আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা
তাদেরকে ত্যাগ করবে বা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে
পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর আদেশ আসে এবং তারা তাতে অবিচল থাকে।

মুআয় ইবনে জাবাল (রা) বলেন, وَهُمْ بِالشَّاءِ تَارَا آتَهُمْ آلَ-শَّاءَ।

ইমাম আহমদ ও তাবারানী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আবু উমামা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَعْدُوهُمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفُهُمْ
إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِّنْ لَوْاءَ حَتَّىٰ يَأْتِيهِمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذِلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيْنَ
هُمْ قَالَ بِبَيْنِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

আমার উম্মতের মাঝে একটি দল হবে যারা সত্যের উপর অবিচল থাকবে বিজয়ী বেশে, শক্রদের পরাভূত করবে। তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাই তারা মোকাবেলা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর আদেশ আসে এবং তারা অবিচল থাকে। বর্ণনাকারীরা রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলুল্লাহ, তারা কোথায়? তিনি (সা) বললেন, তারা বাযতুল মাকদিস ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে।

ইবনে মাজাহ তার সুনানে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَوَامَةٌ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا

আমার উম্মতের মাঝে থেকে একটি দল হবে আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

ইমাম আল হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে বিশ্বস্ত সনদের মাধ্যমে উমর ইবনুল খাতাব (রা) হতে বর্ণনা করেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ

আমার উম্মতের মাঝে থেকে একটি দল হবে যারা সত্যের উপর বিজয়ী বেশে থাকবে যতক্ষণ না কিয়ামত আসে।

ইমাম আহমদ তার মুসনাদে এবং আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থে সাওবান (রা) হতে বর্ণনা করেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ يُأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ

আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকবে যারা হক পথে থাকবে, বিজয়ী থাকবে এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ

পর্যন্ত না আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল-এর আদেশ এসে পৌঁছায়। ইমাম আহমদ, মুসলিম, তিরমিয়ী আরেক বর্ণনায় আরো বলেন, যারা তাদের পরিত্যাগ করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দাওয়াকারী দলটির সম্মান প্রসঙ্গে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) বলেছেন:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا نَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطُونَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَخْرُنُونَ إِذَا حَرَنَ النَّاسُ وَقَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ [أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ]

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা নবীও না, শহীদও না – তবুও শহীদ ও নবীগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ওই বান্দাদের মর্যাদার কারণে তাদেরকে ঈর্ষা করবেন (মর্যাদার স্বীকৃতি দেবেন)। তারা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদেরকে বলুন, তারা কারা? তিনি (সা) জবাব দিলেন, তারা এমন লোক যারা একে অপরকে আল্লাহর রূহের জন্য ভালোবাসবে যদিও তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন বা সম্পদের লেনদেন নেই। আল্লাহর শপথ, তাদের চেহারায় থাকবে নূর এবং তারা থাকবে ন্যৱের উপর। মানুষ যখন ভীত থাকবে তখন তাদের কোনো ভীতি থাকবে না, এবং মানুষ যখন দুঃখে থাকবে তখন তাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন: মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে, না তারা দুঃখ পাবে। [সূরা ইউনুস: ৬২]

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, এই আয়াতে আল্লাহর বন্ধু বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি (সা) বললেন, সেসব লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা পোষণ করে, কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য এর মধ্যে থাকে না। [তাফসীরে মাযহারী]

রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার মর্যাদার খাতিরে যারা পরম্পরের মধ্যে ভালোবাসা স্থাপন করে, তাদের জন্য (পরকালে) ন্যৱের এমন সুউচ্চ মিনার হবে যে, তাদের জন্য নবী এবং শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। [তিরমিয়]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قَالُوا: وَمَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ

ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল। অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে – যেভাবে শুরু হয়েছিল। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তারা কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)?’ তিনি (সা) বললেন, যারা মানুষ খারাপ হয়ে গেলে তাদেরকে ঠিক করবে। [মু'জাম আল আওসাত – তাবারানী] তিরমিয়ির আরেক বর্ণনায় রয়েছে,

الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنْتِي

(তারা হচ্ছে ওরা) যারা আমার পরে মানুষ আমার সুন্নতকে নষ্ট করে দিলে তা ঠিক করবে।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

يَأَتِيَ اللَّهُ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ حُنْ حُنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَلَكُنُّهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَقَالَ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فَقِيلَ مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ صَالِحُونَ فِي نَاسٍ سَوِءٍ كَثِيرٌ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ

শেষ বিচারের দিন আল্লাহ এমন কিছু লোককে উপস্থিত করবেন হবে যাদের নূর হবে সূর্যের মতো। আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা কি আমরা, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)?’ তিনি বললেন, “না, তোমাদের জন্য বিশাল কল্যাণ রয়েছে বরং তারা হচ্ছে কিছু সংখ্যক দরিদ্র দেশত্যাগী যারা উঃখিত হবে পৃথিবীর সব অঞ্চল থেকে।” তারপর তিনি (সা) বললেন, “কল্যাণ হোক অপরিচিতদের (তিনবার)।” জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কারা সেই অপরিচিতরা?’ তিনি (সা) বললেন, “তারা হবে অনেক খারাপ লোকের মাঝে অন্নসংখ্যক সৎ লোক। তাদের মান্যকারীর চেয়ে তাদের অমান্যকারীদের সংখ্যা বেশি হবে।” [মুসনাদে আহমদ, মু'জাম আল আওসাত – তাবারানী]

তিনি (সা) আরো বলেন,

فِإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلٌ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَالِمِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرٍ
خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ وَزَادَنِي غَيْرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ
قَالَ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ

নিশ্চয়ই তোমাদের (সাহাবীদের) পর ধৈর্যের দিন আসবে, সে সময়ে কারো ধৈর্য ধরা
জুলন্ত্ব কয়লা আঁকড়ে ধরার সমতুল্য হবে। আর তার প্রতিদান হবে পঞ্চাশ জনের
প্রতিদানের সমান। তখন একজন সাহাবী (রা) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ'র রাসূল (সা)
তাদের থেকেই পঞ্চাশ (জনের সমান)? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না বরং তোমাদের
মধ্যে থেকে পঞ্চাশ (জনের সমান)। [তিরমিয়ী, আবু দাউদ]

৬.১৫ ইমাম মাহদীকে নিয়ে বিভাস্তু

কেউ কেউ ভুলবশত মনে করেন, ইমাম মাহদী এসে পরবর্তী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন।
প্রকৃতপক্ষে, সহীহ হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, ইমাম মাহদী পরবর্তী খিলাফত
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরে আসবেন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তিনি
আসবেন। ইমাম মাহদীর আগমনসংক্রান্ত আবু দাউদ শরীফের হাদীস থেকে জানা
যায়—

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ
اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ مُؤْتَ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ
مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيَبْيَعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثًا مِنْ
أَهْلِ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَأْ
الشَّامِ وَعَصَابَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيَبْيَعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ
أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ
يَشْهُدْ غَنِيمَةً كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنْنَةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجَرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلَّى عَلَيْهِ
الْمُسْلِمُونَ

নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, একজন খলীফার মৃত্যুর সময় লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে তখন মদীনা থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে মক্কার দিকে ছুটে পালাবে। এসময় মক্কাবাসীগণ তাঁর নিকট এসে তাঁকে জোরপূর্বক ঘর থেকে বের করে আনবে। কিন্তু সে তা পছন্দ করবে না। অতঃপর হায়ারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিম-এর মধ্যবর্তী স্থানের লোকেরা তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করবে। এরপর সিরিয়া থেকে একটি সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হবে। কিন্তু মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘বাইদা’ নামক স্থানে তাদেরকে ভূগর্ভে ফুঁতে ফেলা হবে। তারপর যখন চারদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা এই চাক্ষুষ এই অবস্থা দেখতে পারবে তখন শামের আবদালগণ এবং ইরাকের এক বিরাট দল তাঁর কাছে আসবে এবং তাঁর কাছে বায়াত করবে। এরপর কোরাইশের এক ব্যক্তি-যার মামার বংশ হবে বনু কাল্ব, সেও ইমামের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাবে। ইমামের সেনাবাহিনী তাদের উপর বিজয়ী হবে। এটাই কাল্বের উত্থান। ইমাম মানুষের মধ্যে নবীর আদর্শ মোতাবেক কাজ কর্ম পরিচালনা করবেন এবং তাঁর শাসনামলে ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি সাত বছর অবস্থান করবেন। তারপর ইন্দ্রিকাল করবেন এবং মুসলমানগণ তাঁর জানায়া পড়বে। [আবু দাউদ]

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, একজন খলীফার মৃত্যুর পর ইমাম মাহদী আসবেন, অর্থাৎ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তিনি আসবেন। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এবং তিনি হবেন মুসলমানদের সর্বশেষ খলীফা। অর্থাৎ তার মাধ্যমে খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটবে। মুফতি মুহাম্মদ শাফী (রহ)-এর মতে, “সর্বশেষ খলীফা হবেন হ্যরত মাহদী।” [তাফসীরে মা’আরেফুল কুরআন, ষষ্ঠি খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৮]

সুতরাং ইমাম মাহদী এসে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং ইমাম মাহদীর মাধ্যমে পরবর্তী খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

৭. জিহাদ নিয়ে বিভান্নিদেশ

‘জিহাদ’ শব্দটি এসেছে ‘জাহাদ’ শব্দ থেকে যার অর্থ ‘দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া’। আরবদের কাছে শাব্দিকভাবে ‘জিহাদ’- এর অর্থ হলো ‘কোনো কাজ বা মত প্রকাশ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা বা কঠোর সাধনা করা’। আরো যেসব অর্থে জিহাদ শব্দটি ব্যবহার হয়:

- | | |
|---|---|
| ١. بَذِلْ جُدُّ বা প্রচেষ্টা ব্যয় করা | ٢. الطَّلَاقَةُ বা কঠোর সাধনা করা |
| ٣. السَّعْيُ বা চেষ্টা করা | ٤. الْمُشَفَّهُ বা কষ্ট বহন করা |
| ٥. بَذْلُ الْقُوَّةِ বা শক্তি ব্যয় করা | ٦. النِّهَايَةُ وَالْغَايَةُ বা শেষ পর্যায়ে পৌছা |
| ٧. الْأَرْضُ الصَّلَبةُ বা শক্তভূমি | ٨. الْكَفَاحُ বা সংগ্রাম করা |

ইমাম নিশাপুরী (রহ)-এর তাফসীরে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ‘আল-জিহাদ অর্থ হলো কোনো উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো’।

মোট কথা, শাব্দিক অর্থে ‘জিহাদ’-এর সংজ্ঞা হলো, অন্তর্ভুক্ত দুটি পক্ষের মধ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো।

শাব্দিক অর্থ মোতাবেক, এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সশন্ত্র কিংবা নিরন্তর উভয়ই হতে পারে; অর্থ ব্যয় করেও হতে পারে, ব্যয় না করেও হতে পারে। একইভাবে, দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যেও পরস্পরকে দমানোর জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) হতে পারে। এই জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) কেবল কথার মাধ্যমেও হতে পারে, অথবা কোনো একটি কাজ না করা বা কোনো একটি বিশেষ কথা না বলার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তিকে যদি তার পিতামাতা আদেশ করে আল্লাহকে অমান্য করার জন্য আর সেই ব্যক্তি যদি পিতামাতার নির্দেশ অমান্য করে ও সবর অবলম্বন করে, তবে তা-ও জিহাদ। আবার কোনো ব্যক্তি যদি প্রবৃত্তির তাড়নাকে অগ্রাহ্য করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তবে তা-ও জিহাদ।

জালালাইন শরীফ-এর হাশিয়াতুন জামাল-এ আছে: ‘জিহাদ হলো প্রতিকূলতার মুখে সবর করা। এটা যুদ্ধের সময়ও হতে পারে, নফসের মধ্যেও হতে পারে।’

‘জিহাদ’ শব্দের এই শাব্দিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলিমদের জিহাদের প্রতিপক্ষ হতে পারে নিজের প্রবৃত্তি, শয়তান, দখলদার কিংবা কাফের শক্তি। পাশাপাশি, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জিহাদ হতে পারে আল্লাহর পথেও (জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ)। তাই এই জিহাদ হতে

পারে আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আবার হতে পারে শয়তানকে খুশি করার জন্যও। যেমন: কাফেরদের জিহাদ হলো শয়তানকে খুশি করার জন্য। ইমাম নিশাপুরী (রহ) বলেন, ‘এটি [জিহাদ] হলো কোনো উদ্দেশ্য বা ইচ্ছাকে অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, উদ্দেশ্যকারীর উদ্দেশ্যের ধরন যা-ই হোক না কেন।’ কাফের পিতারা তাদের মুমিন সন্তানদের সত্য বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করানোর জন্য যেসব কাজ করতো, সেগুলোকে কুরআনে জিহাদ বলা হয়েছে:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهِمَا

তোমার পিতামাতা যদি জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করে যে, তুমি আমার সাথে এমন কিছু শরীক কর যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদেরকে অমান্য কর। [সূরা লুকমান: ১৫]

ইসলামী শরীয়াতে ‘জিহাদ’ শব্দটিকে এর সাধারণ শাব্দিক অর্থে না রেখে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট অর্থে সীমিত করা হয়েছে। শরীয়াতের পরিভাষায় জিহাদের অর্থ হচ্ছে ‘আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য সরাসরি বা আর্থিকভাবে বা মুখ্য দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো’। এই বিশেষ অর্থটি প্রদান করা হয়েছে মদীনায়, যেখানে সশন্ত্র যুদ্ধকে ফরয করা হয়েছিল। মক্কায় সশন্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিল না, তাই মাঝী সূরাসমূহে ‘জিহাদ’ শব্দটি শরয়ী অর্থে নয়, বরং শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: সূরা লুকমানের ১৫নং আয়াত, যেটি ইতোমধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে। এরূপ আরো উদাহরণ হলো:

وَمَنْ جَاهَدَ فِي أَنْمَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

আর যে ব্যক্তি সাধনা (জিহাদ) করে, সে তো নিজেরই জন্য সাধনা করে। আল্লাহ তো বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী। [সূরা আনকাবুত: ৬]

وَوَصَّيْنَا أَلِإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطْعِهِمَا

আমি মানুষকে স্বীয় মাতা-পিতার সাথে সম্বন্ধবহার করতে আদেশ দিয়েছি, তবে তারা যদি তোমার উপর চাপ (জিহাদ) দেয়, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, এক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। [সূরা আনকাবুত: ৮]

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِي نَنْهِمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

আর যারা আমার উদ্দেশ্যে কষ্ট সহ্য (জিহাদ) করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের সাথে আছেন। [সূরা আনকাবুত: ৬৯]

فَلَا تُطِعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهَدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সঙ্গে কুরআনের সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) চালিয়ে যান। [সূরা ফুরকান: ৫২]

মদীনায় অবতীর্ণ ২৬টি আয়াতে জিহাদের বিষয়টি এসেছে এবং এগুলোর অধিকাংশই সুস্পষ্টভাবে ‘যুদ্ধ’ (কিতাল) অর্থ বহন করে। যেমন:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الْضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلًا لِّلَّهِ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًاً وَعَدَ اللَّهُ أَلْحَسْنَى وَفَضْلًا لِّلَّهِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

সমান নয় সেসব মুমিন যারা বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে এবং ওইসব মুমিন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। যারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর যারা ঘরে বসে থাকে। আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদী করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর। [সূরা নিসা: ৯৫]

এই আয়াতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ মানে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া এবং ঘরে থাকার চেয়ে সেটা উত্তম। সূরা তওবায় রয়েছে:

أَنْفِرُوا خِفَافًاً وَثِقَالًاً وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذِلِّكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অথবা ভারী অবস্থায়; এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল দিয়ে এবং নিজেদের জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। [সূরা তাওবা: ৪১]

গ্রন্থিতাবলী অনুসৰি এই আয়াতটি সময় প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাখিল হয়। তাবুক যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল খেজুর কাটার মৌসুমে। তখন গরমও ছিল খুব বেশি। তাই কেউ কেউ ক্ষেত্-খামার, ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অজুহাতে, কেউ পারিবারিক কাজের অজুহাতে, কেউ বা অসুস্থতার বাহানা তুলে যুদ্ধ না যাওয়ার অনুমতি চাইলো। আল্লাহর তখন এই আয়াত নাখিল করে তাদের প্রার্থনা বাতিল করে দিলেন এবং ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক, খুশি-অখুশি, সশন্ত-নিরস্ত, ধনী-গরিব সবার জন্য যে কোনো অবস্থায় যুদ্ধে যাওয়া ফরয করে দিলেন। এখানে ‘জিহাদ’ শব্দটি পরিষ্কারভাবে ‘যুদ্ধ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একই অর্থে রয়েছে এই সূরার ৮৮ নাম্বার আয়াতেও:

لَكِنِ الْرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
أَحْبَّرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

কিন্তু রাসূল ও যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা জিহাদ করেছে নিজেদের মাল ও নিজেদের জান দিয়ে, তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই প্রকৃত সফলকাম। [সূরা তাওবা: ৮৮]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, মাদানী আয়াতসমূহে ‘জিহাদ’ বলতে যুদ্ধ/লড়াইকে বোঝানো হয়েছে। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতসমূহ জিহাদের পূর্বশর্ত বা জিহাদের বৈধতার শর্তও স্পষ্ট করে দেয়। আর এই শর্তগুলো হলো: অমুসলিমদেরকে ইসলাম প্রচারের দাওয়া এবং/অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত মেনে নেওয়া।

রাসূল (সা)-এর শতশত হাদীসে ‘জিহাদ’-কে শরয়ী অর্থে অর্থাৎ যুদ্ধ ও যুদ্ধের উপায়-উপকরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) বলেছেন,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ
صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّىٰ يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের তুলনা ওইরূপ রোয়াদার, যে নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছে – যে তার রোয়া ও নামায আদায়ে বিন্দুমাত্র ঝালিত্ব

প্রকাশ করে না; (সে এৱং সওয়াব পেতেই থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মুজাহিদ ফিরে আসে। [বুখারী, মুসলিম]

এই হাদীসে পরিষ্কারভাবেই ‘মুজাহিদ’ বলতে ঘোনাকে বোঝানো হয়েছে - যে ঘোনা ‘যতক্ষণ না ফিরে আসে’ ততক্ষণ পর্যন্ত হাদীসে বর্ণিত সওয়াবসমূহ পেতেই থাকে। অন্য হাদীসে, আবদুল্লাহ বিন উবশী (রা) বলেন,

قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَا لِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ
قَالَ مَنْ أَهْرِيقَ دَمُهُ وَعَقِرَ جَوَادُهُ

লোকেরা রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ‘কোন জিহাদ উত্তম?’ তিনি (সা) জবাব দেন, জীবন ও সম্পদ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কী ধরনের মৃত্যুবরণ করা উত্তম? তিনি (সা) জবাব দিলেন, ওই ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং সাথে তার সওয়ারী ঘোড়ার পাও কেটে ফেলা হয়। [আবু দাউদ]

মুসনাদে আহমদ-এ বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে,

... أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ

[রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,] কোন জিহাদ উত্তম? তিনি (সা) বললেন, যে (যুদ্ধের অবস্থায়) তার ঘোড়ার পা কর্তন করে ফেলল এবং তার রক্তও প্রবাহিত হয়েছে (তার জিহাদ)।

আরেক হাদীসে ইবনে আবুস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন,

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأَحْدِ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طِيرٍ خُضْرٍ تَرِدُّ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ
تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعْلَقَةً فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا
طِيبَ مَا كَلِّهُمْ وَمَشْرِبَهُمْ وَمَقِيلَهُمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ
لِئَلَّا يَرْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا أَبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ

যখন উভদ যুদ্ধে তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হলো, আল্লাহ তাদের বুহগুলোকে সুবজ পাখির পালকের ভিতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝরণা ও উদ্যাসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তাঁরা সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁদের জন্য আল্লাহর আরশের নিচে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন তাঁরা নিজেদের আনন্দ ও শান্তিময় জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন

বললেন, ‘আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে (অংশগ্রহণের) চেষ্টা করে।’ তখন আল্লাহ বললেন, ‘তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ নং আয়াত নামিল হয়:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

আর যারা আল্লার পথে শহীদ হয়, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাণ। [আবু দাউদ, তাফসীরে কুরতুবী]

প্রকৃতপক্ষে সশন্ত্র যুদ্ধে অর্থাৎ জিহাদে মৃত্যুবরণ করা খোদ রাসূল (সা)-এরই একান্ত বাসনা ছিল:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي
وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفُ عَنْ سَرِيرَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ
أُقْتَلُ

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কিছু মুমিন এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আদৌ পছন্দ করবে না, অথচ তাদের সবাইকে আমি সওয়ারী দিতে পারছি না, এই অবস্থা না হলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল হতেও দূরে থাকতাম না। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই তারপর আবার জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই। [বুখারী, মুসলিম]

শরয়ী অর্থ ও শাব্দিক অর্থের পার্থক্য:

শাব্দিক অর্থ ও শরয়ী অর্থের এ পার্থক্য ইসলামের প্রত্যেকটি পরিভাষার ক্ষেত্রে রয়েছে। সুতরাং এ পার্থক্যকে না জানা অথবা না জানার ভাবে করা কোনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এরূপ পার্থক্যের কিছু উদাহরণ:

সালাত এর শাব্দিক অর্থ হলো, আগুনে পুড়ে বাঁশ বা সরু গাছ সোজা বা বাঁকা করে (ধনুক তৈরি বা অন্য কাজের) ব্যবহার উপযোগী করা। এছাড়া ব্যবহারিকভাবেও সালাত শব্দটি চার অর্থে প্রয়োগ হয়। যথা: ১. দরবন্দ ২. তাসবীহ ৩. রহমত ৪. ইস্ত্রিগফার।

কিন্তু আমরা সালাত বলতে বুঝি নির্ধারিত সময়ে, বিশেষ নিয়মে, নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত করাকে।

সাওম এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। কিন্তু সাওম বলতে আমরা বুঝি, নির্ধারিত সময়ে বিশেষ নিয়মে, নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত করাকে।

হজ্জ এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। কিন্তু হজ্জ বলতে আমরা বুঝি, নির্ধারিত সময়ে বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম বিশিষ্ট ইবাদত পালন করাকে।

যাকাত এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা। কিন্তু যাকাত বলতে আমরা বুঝি, বিশেষ শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ, নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা।

একইভাবে জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ কষ্ট করা, চেষ্টা করা হলেও জিহাদ বলতে আমরা বুঝবো ইসলামী খিলাফতের পক্ষ থেকে, খলীফার নির্দেশে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে।

আমরা জানি হয়রত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের মক্কী জীবনে দাওয়াত-তাবলীগ ছিল, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারসহ যিকির-ফিকির ও জালিমের সামনে হক কথা বলা ছিল, ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু এতসব কর্মকাণ্ডকে মক্কী জীবনকে জিহাদ বলা হয়নি। সাহাবায়ে কিরামও দাবি করেননি এসব সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বা প্রাণান্তর চেষ্টার নাম জিহাদ ছিল।

শরয়ী অর্থে জিহাদের প্রয়োগ

কুরআন-সুন্নাহর এসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ ‘জিহাদ’ শব্দটিকে সাধারণ অর্থ থেকে বিশেষ অর্থ ‘কিতাল’ বা যুদ্ধ ও যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বিষয়াদিতে রূপান্তর করেছেন। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস-সহ আরো বিপুল সংখ্যক আয়াত-হাদীসে ‘জিহাদ’-কে যুদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্যই দেখা যায় যে, ইসলামী আইনশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে আইবিদগণ ‘জিহাদ’-কে শরয়ী অর্থে তথা যুদ্ধ অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

হানাফী মাযহাবের আইন গ্রন্থ ‘বাদাইস সানায়ী’-হতে জানা যায়, ‘জিহাদের শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা। শরয়ী অর্থে জিহাদ হলো নফস, অর্থ ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও শক্তি খাটানো।’ অপর হানাফী গ্রন্থ *الْوَقَائِيَّةِ شَرْحُ* -এর গ্রন্থকার বলেন:

أَجْهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مِنْ لَمْ يَقْبِلْهُ

অর্থাৎ জেহাদ হচ্ছে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা এবং তা অগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

শাফেই মাযহাবের আইনগ্রন্থ আল ইকনা-তে বলা হয়েছে, ‘জিহাদ হলো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।’ আল-শিরাজী তার আল মুহাজাব-এ বলেন, ‘জিহাদ হলো কিতাল (যুদ্ধ)।’

বুখারী শরীফ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম ইবন হাজার (রহ) ফাতহুল বারী-তে বলেন, জিহাদ-এর শরঙ্গি অর্থ হলো وَشَرْعًا بَذْلُ الْجُهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা-সংগ্রাম করা।

মালিকী মাযহাবের আইনগ্রন্থ মানহুল জালীল-এ জিহাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে –

قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرِ ذِي عَهْدٍ لِّغَالَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ

‘আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চ করার জন্য কাফেরদের (যাদের সঙ্গে মুসলিমদের চুক্তি নেই) সঙ্গে মুসলিমদের লড়াই... ...।’

হাস্বলী মাযহাবের আইনগ্রন্থ আল-মুগনী-তে ইবনে কুদামা-ও ভিন্ন কোনো সংজ্ঞা দেননি। ‘কিতাবুল জিহাদ’ অধ্যায়ে তিনি বলেন, যা কিছুই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেটা ফরয-ই-আইন বা ফরয-ই-কিফায়া যা-ই হোক না কেন, অথবা এটা মুমিনদেরকে শক্র থেকে রক্ষা করা হোক বা সীমান্ত রক্ষা হোক – সবকিছুই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, ‘শক্রো এলে সীমান্তেরক্ষীদের ওপর জিহাদ করা ফরয-ই-আইন হয়ে যায়। যদি শক্রদের আগমন স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমীরের নির্দেশ ছাড়া সীমান্তেরক্ষীরা তাদেরকে মোকাবেলা না করে আসতে পারবে না। কারণ একমাত্র আমীরই যুদ্ধের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন।’

এছাড়া বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাতসহ সকল হাদীস গ্রন্থে ‘কিতাবুল জিহাদ’ অধ্যায় কেবল সশন্ত যুদ্ধ বিষয়ক হাদীসই স্থান পেয়েছে।

অতএব এটা নিশ্চিত যে, ইসলামী শরীয়াতে ‘জিহাদ’ শব্দটিকে সাধারণ শাব্দিক অর্থ থেকে সুনির্দিষ্ট অর্থে রূপান্তর করা হয়েছে আর সেই অর্থটি যুদ্ধ/লড়াই ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু আজ অজ্ঞানতা, মূর্খতা, কাফেরদের ঘড়্যন্ত্র ও তাদের তাবেদার শাসকদের সহায়তায় জিহাদের মতো সুস্পষ্ট ব্যাপারকেও ধোঁয়াটে করে ফেলা হয়েছে।

বিভান্তি সৃষ্টিকারীরা বলছে যে, জিহাদ দুই রকম: জিহাদ-আল-আকবর (বড় জিহাদ) যা নফসের বিরুদ্ধে করা হয় এবং জিহাদ-আল-আসগর (ছোট জিহাদ) যা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে করা হয়।

নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তারা ‘তারীখে বাগদাদ’ গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি হাদীস ব্যবহার করে, যেখানে দাবি করা হয় যে, রাসূল (সা) বলেছেন: ‘আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে প্রবেশ করলাম।’ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: বড় জিহাদ কী? তিনি (সা) বললেন, ‘নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ’।

যদিও এটা সত্য যে, নফস বা শয়তানের বিরুদ্ধেও জিহাদ রয়েছে, কিন্তু এই জিহাদ কখনোই আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জিহাদের চেয়ে বড় নয়। কেননা, প্রথমত, কুরআন-হাদীসের শত শত আয়াত ময়দানের জিহাদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে। দ্বিতীয়ত, বিভান্তি সৃষ্টিকারীদের ব্যবহৃত হাদীসটিকে ইমাম জালালউদ্দিন সুযুতী তাঁর ‘আল-জামী’ আস-সাগীর গ্রন্থে ‘জায়িফ’ বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম জাহাবী, দারা কুতুনী, আহমদ ইবনে হাম্বলসহ বহু মুহাদ্দিস এই কথিত হাদীসটি বাতিল করে দিয়েছেন। একটি ‘জায়িফ’ হাদীস দিয়ে বিপুল সংখ্যক মুতাওয়াতির বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করাটা মূর্খতা, গোঁড়ামির পরিচায়ক।

জিহাদ কি শুধু রক্ষণাত্মক?

কাফেরদের চক্রান্তে পা দেয়া আরেক দল জ্ঞানপাপী প্রচার করে যে, জিহাদ শুধুমাত্র রক্ষণাত্মক – এটি আক্রমণাত্মক নয়। এদের এই বক্তব্য আল্লাহর কুরআন, রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ ও মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا أُجْزِيَةً
عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ

তোমরা যুদ্ধ করতে থাক আহলে কিতাবের ঐ লোকদের বিরুদ্ধে, যারা ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, এবং অনুসরণ করে না প্রকৃত সত্য দ্বীন, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে, স্বহস্ত্রে জিয়িয়া প্রদান করে। [সূরা তাওবা: ২৯]

রাসূল (সা) বলেন:

أَمْرُتُ أَنْ أَقِاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ...

আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যতক্ষণ না তার সাক্ষ্য দেয় যে, লা ইলাহা ইল্লাহ আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ এবং তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে... / [বুখারী]

রাসূল (সা) ছনায়নের যুদ্ধে হাওয়াজিন আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন এবং মুতার যুদ্ধে রোমানদের আক্রমণ করতে সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন। এগুলো সবই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। বস্তুত রাসূল (সা)-এর জীবনে সংগঠিত ২য় হিজরীর বদর থেকে শুরু ৯ম হিজরীর তারুক পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল আক্রমণাত্মক।

হযরত আল্লামা ইদরিস কান্দলভী (রহ) এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন যে, “রাসূলে কারীম (সা) কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত অধিকাংশ যুদ্ধসমূহ ছিল আক্রমণাত্মক (Offensive) এবং প্রতিরোধাত্মক (Defensive) ছিল কম। অনুরূপভাবে ইসলামী খলীফা ও রাষ্ট্রপ্রধানগণের অধিকাংশ অভিযান ছিল আক্রমণাত্মক এবং তৎক্ষণিক। যেসব লোক বলে যে ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ নেই, শুধু প্রতিরোধাত্মক জিহাদ আছে, তারা হল কোরআন ও সুন্নাহর বিকৃতকারী এবং বুজুর্গদের অতীত ইতিহাস গোপনকারী। বাতিলের ভয়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত এসব মানুষের কোনো বক্তৃতা বালেখার ওপর আস্থা রাখা উচিত নয়। [আল্লামা মোহাম্মদ ইদরিস কান্দলভী, “দস্তুর-ই-ইসলাম”, লাহোর, পৃষ্ঠা: ৩০]

সাহাবীদের যুগেও আক্রমণাত্মক জিহাদের মাধ্যমেই ইরাক, পারস্য, শাম, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা বিজয় হয়েছে। তাই আক্রমণাত্মক জিহাদের বিষয়ে সাহাবীদের ইজমা ও সুস্পষ্ট। স্পেন, ভারতবর্ষ, এমন কি বাংলাদেশও সাহাবীদের পরবর্তী যুগের আক্রমণাত্মক জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামের পতাকাতলে এসেছিল।

ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আক্রমণাত্মক জিহাদের যাত্রা আবার শুরু হবে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে শাহাদাতের পতাকা উড়বে ইনশাআল্লাহ।

أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّبُوفِ

জান্নাত তরবারীসমূহের ছায়ার নিচে / [বুখারী]

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّبُوفِ

জান্নাতের দরজাগুলো তরবারীসমূহের ছায়ার নিচে। [মুসলিম]

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُرْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

যে ব্যক্তি যুদ্ধে কখনো অংশ নেয়ানি এবং মনে মনে তার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ না করে মারা যায়, সে মুনাফিকত্বের একটি শাখায় মৃত্যবরণ করলো। [মুসলিম]

৮. পরবর্তী খিলাফত প্রতিষ্ঠা

রাসূল (সা) বলেছেন:

تَكُونُ النُّبُوَّةِ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصِيًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَّ

তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে নবুয়্যতের আদলের খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, অতঃপর আল্লাহ তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে কামড়ে ধরে থাকা শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের ওপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর ফিরে আসবে নবুয়্যতের আদলের খিলাফত।’ এরপর তিনি (সা) নীরব থাকলেন। [আহমদ]

এই হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে জুলুমের যুগে অবস্থান করছে। ১৯২৪ সালে তুরক্ষে আল্লাহর আইনের শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে সারা বিশ্বে এখন চলছে জুলুমের শাসন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

আলাহ যা নায়িল করেছেন তা অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই তো জালিম। [সূরা আল মায়িদা: ৪৫]

এই জুলুমের শাসনের পর আবার প্রতিষ্ঠিত হবে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুয়্যাহ (নবুয়্যতের আদলের খিলাফত)। সেই খিলাফত পৃথিবীর সকল প্রান্তে ইসলামের শাসন কর্তৃত বিস্ত করবে। কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর শাসনকাল পর্যন্ত সেই খিলাফত টিকে থাকবে।

মেক্দাদ ইবন আস্ওয়াদ (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই বলতে শুনেছেন,

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهِيرَ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدَرٌ وَلَا وَبَرٌ إِلَّا دَخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةً الْإِسْلَامِ بِعِزْ عَزِيزٍ
أَوْ ذُلْ ذَلِيلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذْلِلُهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا

জমিনের উপর কোনো মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকি থাকবে না যাতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিবেন না – সম্মানীর ঘরে সম্মানের সঙ্গে এবং অপমানিতের ঘরে অপমানের সঙ্গে। (অর্থাৎ) আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন (স্বেচ্ছায় ইসলাম এহণের উপযুক্ত করে দিবেন), পক্ষান্তরে যাদেরকে অপমানিত করবেন তারা (কর দানে

ইসলামী কর্তৃত্বের) বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। [আহমদ, হাকিম, তাবারানী, বায়হাকী]

তামিম আল দারি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন,

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرِ وَلَا وَبِرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ
اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزْ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلٍ ذَلِيلٍ عِزًا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ
الْكُفْرَ

নিচয়ই এই বিষয় [ইসলাম] সেখান পর্যন্ত পৌছাবে যেখান পর্যন্ত পৌছায় দিন ও রাত এবং কোনো মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর (তাঁরু) বাকি থাকবে না যাতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের বাণী পৌছিয়ে দিবেন না - সম্মানীর ঘরে সম্মানের সঙ্গে এবং অপমানিতের ঘরে অপমানের সঙ্গে। (অর্থাৎ) আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের উপযুক্ত করে দিবেন, পক্ষান্তরে যাদেরকে অপমানিত করবেন তাদেরকে অপমানিত করবেন কুফর দ্বারা। [আহমদ, তাবারানী, হাকিম]

আব সালাবাহ আল-খাশনি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ أَبَاكِ بِأَمْرٍ لَمْ يَبْقَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ بَيْتِ مَدْرِ ، وَلَا شَعْرَ ،
إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ بِهِ عِزًا أَوْ ذُلًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ حِينَ يَبْلُغَ اللَّيْلَ

আল্লাহ আজজা ওয়া জাল তোমার পিতাকে যে বিষয়সহ পাঠিয়েছেন সেটা প্রবেশ করবে না এমন কোনো মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর (তাঁরু) বাকি থাকবে না - সম্মানীর ঘরে প্রবেশ করবে সম্মানের সঙ্গে এবং অপমানিতের ঘরে অপমানের সঙ্গে - যতক্ষণ এটা সেখান পর্যন্ত পৌছায়, যেখান পর্যন্ত পৌছায় রাত। [হাকিম, তাবারানী]

ইমাম নববী তার শরহে মুসলিম গ্রন্থে (অধ্যায় ১৮, পৃষ্ঠা ১৩), আবু দাউদ তার সুনানে (হাদীস ৪২৫২), তিরমিয়ী (অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ২৭), ইবনে মাজাহ (২৯৫২), আহমদ তার মুসনাদে (অধ্যায় ৫; পৃষ্ঠা ২৭৬, ২৮৪) এবং আল হাকিম তার আল মুসতাদরাকে (৪/৪৭৯) গ্রন্ত সাওবান হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ زَوِي لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَسَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيِّلْغُ مُلْكَهَا مَا زُوِي
لِي مِنْهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ পৃথিবী (এর সব প্রান্কে) এক করে আমাকে দেখিয়েছেন। আমি তার পূর্ব অংশ ও পশ্চিম অংশ দেখেছি। এবং নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কর্তৃত্ব তাতে পৌঁছুবে যা আমার জন্য এক করা হয়েছিল তা হতে।

এসব হাদীসে পৃথিবীর সকল প্রান্তে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব পৌঁছে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইনশাল্লাহ পরবর্তী খিলাফত পৃথিবীর সকল প্রান্তে ইসলামের শাসন কর্তৃত্ব বিস্ত করবে।

ইবনে হিবানের সহীহ রেওয়ায়েতে রয়েছে, শেষ জামানায় আল-শাম [বর্তমান জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও ইরাকের কিছু অংশ] হবে মুমিনদের ‘উকর’ [স্থান]। মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীতেও অনুরূপ রেওয়ায়াত রয়েছে। মুমিনদের প্রথম উকর ছিল মদীনায় – যেখানে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

আল হাকিম তার আল-মুসতাদরাক ৪/৪৬৮, আহমদ তার মুসনাদ ২/৮৪ এবং আবু দাউদ তার সুনান (নং ২৪৮২) গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন, দুটি হিজরতের (দেশত্যাগ) ঘটনা ঘটবে এবং তার শেষটি হবে সেখানে, যেখানে তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ) হিজরত করেছিলেন [আল-শামে]।

প্রথম হিজরতটি ছিল মদীনায় রাসূল (সা)-এর হিজরত – ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে যেখানে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় হিজরতটি হবে শাম অঞ্চলের দিকে অর্থাৎ পরবর্তী খিলাফতের উকরের দিকে।

ইবনে আসাকির-এর “দামেক্সের ইতিহাস” গ্রন্থে ইউনুস ইবনে মায়সারা ইবনে হালবাস হতে বর্ণিত,

هذا الْأَمْرُ كائِن بَعْدِي بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ بِالشَّامِ ثُمَّ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ
بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ إِفَادَا كَانَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَشِمْ عَقْرَ دَارِهَا وَلَنْ يَخْرُجَهَا قَوْمٌ فَتَعُودُ
إِلَيْهِمْ أَبَدًا

রাসূল (সা) বলেন, এই শাসন ব্যবস্থা (খিলাফত) আমার পর থাকবে মদীনায়, তারপর আল-শামে, তারপর আরব উপদ্বীপে, তারপর ইরাকে, তারপর (হীরাকলের) শহরে, তারপর বায়তুল মাকদিসে (আল-কুদ্স)। এবং যখন আল-কুদ্সে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন

সেটাই হবে তার স্থান। এরপর লোকেরা (কেউ) তা কখনো বের (পরিবর্তন) করে দিতে পারবে না এবং তা চিরকালের জন্য তাদের কাছে ফিরে আসবে।

পূর্ববর্তী খলীফাদের সময়ে এই উম্মাহ খিলাফতের রাজধানী দেখেছে মদীনায়, আল-শামে, ইরাকে ও (হীরাকলের) শহরে অর্থাৎ ইস্ত্রাম্বুলে। ইনশাল্লাহ আবার যখন খিলাফত ফিরে আসবে তখন তার রাজধানী হবে আল-কুদ্স (জেরুজালেম)।

ইবনে সাদ ও কানজুল উম্মাল ১৪/২৫২ এর গ্রন্থকার উভয়ে আবু উমায়রা আল মাযানী হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন,

تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَيْعَةً هَدِي

বায়তুল মাক্দিসে একটি হেদায়েতপূর্ণ আনুগত্যের শপথ নেয়া হবে।

ইমাম আহমদ তার মুসনাদ (৫/২৮৮), আবু দাউদ তার সুনান (নং ২৫৩৫) এবং হাকিম তার আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন,

**يَا ابْنَ حَوَالَةَ، إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَّلْتُ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَّتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ
وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ**

হে ইবন হাওয়ালা, যখন তুমি দেখবে খিলাফত পবিত্র ভূমিতে (আল-কুদ্স) ফেরত এসেছে তখন ভূমিকম্প, দুর্যোগ ও এন্ডুপ বিশাল ঘটনা অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর তখন কিয়ামত মানুষের তত্ত্বকু কাছে চলে আসবে আমার এই হাত থেকে তোমার মাথার দুরত্ব যত্নকু। [রাসূল (সা) এই হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবী আবদুল্লাহ বিন হাওয়ালার মাথা/কপালে হাত রেখে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন।]

ইমাম নববী তার শরহে মুসলিম গ্রন্থে (১৮/৩৮-৩৯) ও ইমাম আহমদ তার মুসনাদে (৩/৩১৭) জাবির হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন,

يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْشِي الْمَالَ حَثِيًا لَا يَعْدُهُ عَدَدًا

আমার উম্মতের শেষের দিকে একজন খলীফা আসবে যে সম্পদ বিতরণ করবে কোনো গণণা ছাড়াই। আরেকটি বর্ণনায় রাসূল (সা) বলেন, শেষ যমানায় একজন খলীফা আসবে যে কোনো গণণা ছাড়াই সম্পদ বিতরণ করবে। [মুসলিম]

ইমাম আহমদ তার মুসনাদে (২/১৭৬), আল দারিমি তার মুসনাদে (অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ১২৬) ও আল হাকিম তার আল মুসতাদরাক (৩/৪২২) এ আবু কাবিল হতে বর্ণনা করেন,

... سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمَدِيَّتَيْنِ تُفْتَحُ أَوْلًا قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدِيَّةٌ هِرَقْلُ تُفْتَحُ أَوْلًا يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ

... রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, “কোন শহরটি আগে জয় করা হবে, কনস্ট্যান্টিনোপোল নাকি রোম?” রাসূল (সা) বললেন, ‘ইরাকলের নগরী প্রথম জয় করা হবে’ অর্থাৎ কনস্ট্যান্টিনোপোল।

হাদীসে উল্লেখিত প্রথম বিজয়টি ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে। কনস্ট্যান্টিনোপোল ইসলামের অধীনে এসেছে উসমানীয় সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতেহ-এর আমলে ১৪৫৩ সালে। রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যৎবাণীর ৮০০ বছর পর এ বিজয় অর্জিত হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় পরবর্তী খিলাফত রোম বিজয় করবে - সেটাও বেশি দূরে নয়।

সার্বিক আলোচনায় স্পষ্ট যে, খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি মুতাওয়াতির বিল মা'না [বহু সংখ্যক শুন্দ বর্ণনা] হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। এক হিসেবে দেখা যায়, খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত হাদীসসমূহ অন্তত ২৫ জন সাহাবী, ৩৯ জন তাবেয়ী ও ৬২ জন তাবে-তাবেয়ী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তাই খিলাফতের পুনরাগমন শরীয়াতের অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণিত বিষয়।

সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أُسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেমন তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে...। [সূরা আন নূর : ৫৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে বিজয়ের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, রাসূল (সা) খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দ্বীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যত্বাণী করেছেন এবং শরীয়াত আমাদেরকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ করছে।

সবশেষে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, ‘হে আল্লাহ, আমাদেরকে এমন এক অসাধারণ ঈমান দান কর, যার দৃঢ়তা কিয়ামতের দিন নূর ছড়াবে। হে রব, তোমার প্রতিশুত ও তোমার রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যত্বাণীকৃত খিলাফতে রাশেদা আমাদেরকে দান কর। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সবখানে সেই খিলাফতের বিশ্বি ঘটানোর

তৌফিক আমাদেরকে দাও, হে মালিক। অভিশপ্ত ইহুদীদের কাছ থেকে পবিত্র ভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করার ব্যবস্থা কর, হে আল-হাইয়ু আল-কাইয়ুম। হে বিচার-দিবসের অধিপতি, জান্নাতে আমাদেরকে নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের সাহচর্য দিও। ইয়া রাবাল আলামীন, আল্লাহুম্মা আমীন।'

আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যে সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

দাওয়া করার প্রকৃত কারণ হলো ঈমান

রাসূল (সা) যখন থেকে ওহী পাওয়া শুরু করেন তখন থেকেই তিনি দাওয়া করা শুরু করেন। ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবী (রা)-গণও একইভাবে দাওয়া শুরু করেন। রাসূল (সা) ও তাঁর মহান সাহাবীগণ এভাবেই ঈমানকে বুঝেছিলেন। আমল ব্যতীত ঈমানের কোনো তাৎপর্য নেই:

وَالْعَصْرِ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۗ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ

কসম যুগের। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত – তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরম্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের ও সবরের। [সূরা আসর: ১-৩]

এই মহান সূরায় আল্লাহ সুবানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈমানের সঙ্গে সৎকর্ম করা, সত্য ও সবরের উপদেশ প্রদান করাকে শর্ত্যুক্ত করেছেন। বস্তুত পরিত্র কুরআনের বহু আয়াত থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ঈমানের তাড়নাতেই বান্দা সৎকর্ম তথা সত্যের উপদেশ প্রদান করতে বাধ্য। যেমন:

وَبَشَّرَ رَبِّ الْأَنْوَارِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। [সূরা বাকারা: ২৫]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ أَجْنَانٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

পক্ষাল্পে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাঁরা জান্নাতের অধিবাসী। তাঁরা সেখানেই চিরকাল থাকবে। [সূরা বাকারা: ৮২]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنْدِخْلُهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ

আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। [সূরা নিসা: ৫৭]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنْدِخْلُهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে সত্ত্বার উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। [সূরা নিসা: ১২২]

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا نَهَا
خَالِدِينَ فِيهَا يَوْمَ رَبِّحُمْ

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্বারণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অনন্মকাল থাকবে। [সূরা ইবরাহীম: ২৩]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْوِنٍ

নিচ্যই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে অগণিত প্রতিদান যা কখনো রহিত হবার নয়। [সূরা হামীম আস-সিজদাহ: ৮]

ثُمَّ رَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرُ مَنْوِنٍ

অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিই হীন থেকে হীনতম অবস্থায়। তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য রয়েছে অগণিত প্রতিদান যা কখনো রহিত হবার নয়। [সূরা তীন: ৫-৬]

কুরআনের আয়াতসমূহের এমন সুস্পষ্টতা সত্ত্বেও অনেকেই আজ ঈমানের প্রকৃত দাবি উপলব্ধি করতে পারছেন না। আমাদের পূর্ববর্তী যুগেও কারো কারো মধ্যে এরূপ বিভ্রান্তি ছিল।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক আল মুসাইসি বলেন: ১৭০ হিজরিতে আমরা সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহর সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাকে ঈমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি জবাব দিলেন, ‘এটা হলো সত্যের স্বীকোরোক্তি ও আমল।’

লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, এটা কি বাড়ে-কমে?

তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এটা বাড়ে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এটা কমে; এমনভাবে কমে যে আর এতটুকুই বাকি থাকে [তিনি তার বাম হাত দিয়ে তা দেখান]।

লোকটি প্রশ্ন করলো, ঈমানকে যারা আমলহীন স্বীকোরোক্তি বলে তাদেরকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করবো?

সুফিয়ান জবাব দিলেন, ঈমানের বিধিবিধান ও সীমাগুলো নির্ধারিত হওয়ার আগে তারা এই কথাটি বলতো। আসলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-কে মানবজাতির কাছে এই কথা বলার জন্য পাঠ্যেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোই উপাসনা পাওয়ার অধিকার নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। মানুষ এটা বলার পর তাদের রক্ত ও সম্পদ (বৈধ কারণ ব্যতীত) নিরাপত্তা পেল এবং তাদের হিসাব হবে আল্লাহর সাথে। যখন আল্লাহ আল-হাইয়ু আল-কাইয়্যম এই বিষয়ে তাদের অন্঱ের সত্যতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলেন তখন তিনি রাসূল (সা)-কে বললেন তাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিতে। রাসূল (সা) তাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিলেন ও তারা তা পালন করলেন। আল্লাহর শপথ, তারা যদি এটা না করতো তাহলে তাদের প্রথম কাজটা কোনোই উপকারে আসতো না।

যখন আল্লাহ আল-হাইয়ু আল-কাইয়্যম এই বিষয়ে তাদের অন্঱ের সত্যতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলেন তখন তিনি রাসূল (সা)-কে বললেন তাদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিতে। রাসূল (সা) তাদেরকে সেই নির্দেশ দিলেন ও তারা তা পালন করলো। আল্লাহর শপথ, তারা যদি এটা না করতো তাহলে তাদের প্রথম কাজ কিংবা নামায কোনোটাই তাদের উপকারে আসতো না।

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই বিষয়ে তাদের অন্঱ের সত্যতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলেন তখন তিনি রাসূল (সা)-কে বললেন তাদেরকে মকায় ফেরার নির্দেশ দিতে যেন তারা তাদের (কাফের) পিতা ও সন্নদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যতক্ষণ না তারা (কাফেররা) সেই কালিমাটি বলে যেটি তারা নিজেরা বলেছে, তাদের সাথে নামায পড়ে ও তাদের হিজরতের সাথে যুক্ত হয়। রাসূল (সা) তাদেরকে সেই নির্দেশ দিলেন ও তারা তা পালন করলো। আল্লাহর শপথ, তারা যদি এটা না করতো তাহলে প্রথম কাজ, নামায কিংবা হিজরত কোনোটাই তাদের উপকারে আসতো না।

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই বিষয়ে তাদের অন্঱ের সত্যতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলেন তখন তিনি রাসূল (সা)-কে বললেন তাদেরকে নির্দেশ দিতে তারা যেন হিজরত করে এসে আল্লাহকে উপাসনার জন্য কাবা তাওয়াফ করে ও দীন-ইনভাবে মাথার চুল ছেটে ফেলে। রাসূল (সা) তাদেরকে সেই নির্দেশ দিলেন ও তারা তা পালন করলো। আল্লাহর শপথ, যদি তারা এটা না করত তাহলে তাদের প্রথম কাজ, তাদের নামায, তাদের হিজরত কিংবা পিতার সাথে যুদ্ধ করা কোনোটাই তাদের উপকারে আসতো না।

যখন আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলা এই বিষয়ে তাদের অন্঱ের সত্যতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলেন তখন তিনি রাসূল (সা)-কে বললেন তাদেরকে নির্দেশ দিতে তারা যেন হিজরত করে গিয়ে নিজেদের সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে, যাতে সেই সম্পদ পরিত্রাতা

অর্জন করে। রাসূল (সা) তাদেরকে সেই নির্দেশ দিল এবং তারা তা পালন করলো ...
...। আল্লাহর শপথ, তারা যদি এটা না করতো তাহলে তাদের প্রথম কাজ, তাদের
নামায, তাদের হিজরত, তাদের পিতাদের সাথে যুদ্ধ কিংবা তাদের তাওয়াফ কোনোটাই
তাদের উপকারে আসতো না।

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বিষয়ে তাদের অন্঱রের সত্যতার ব্যাপারে
সন্তুষ্ট হলেন, যেটা ঈমানের বিধিবিধান ও সীমাগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলো, তখন
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বললেন:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمْ أَلْإِسْلَامُ
دِينًا

আজ হতে তোমাদের জন্য তোমাদের ধীনকে পূর্ণ করলাম, আমরা নিয়ামতকে সম্পূর্ণ
করলাম তোমাদের প্রতি এবং ইসলামকে তোমাদের ধীন হিসেবে মনোনীত করলাম।
[সূরা মায়দাহ: ৩]

সুফিয়ান এরপর বললেন, ‘তাই কেউ যদি ঈমানের কোনো একটি অংশ বাদ দেয়
তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে সে ঈমানহীন (কাফের)। অবশ্য যদি সে আলস্য বা অবহেলার
কারণে তা ত্যাগ করে থাকে, তাহলে আমরা তাকে শুধরাবো এবং আমাদের দৃষ্টিতে সে
দুর্বল/অপূর্ণ ঈমানের অধিকারী। এটাই সুন্নাহ। কেউ এ বিষয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা
করলে এই কথাগুলো আমার বরাত দিয়ে বলবে।’

সুতরাং ঈমানকে আমাদের সেভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে সাহাবী (রা)-গণ বুঝেছিলেন।
আর সেই ঈমানের তাগিদেই আমাদেরকে সাহাবীদের মতো দাওয়ার মাধ্যমে ইসলামী
রাষ্ট্র তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সেই রাষ্ট্রের মাধ্যমে ইসলামকে পৃথিবীর
প্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে।

সঠিক বন্ধনের ভিত্তি

- ◆ একটি দাওয়াকারী দলের আমাদের যোগ দেয়ার একমাত্র কারণ ঈমান।
- ◆ এখন বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, এই দলের সদস্যদের মধ্যকার বন্ধনটি কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে? এর উত্তর হচ্ছে, এই দলের সদস্যদের বন্ধনের একমাত্র ভিত্তিও ঈমান।
- ◆ হাদীস শরিফে আছে, কিয়ামতের দিন যে সাত ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে তাদের মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তি হচ্ছে তারা যারা পরম্পরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে। [বুখারী ও মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা বলবেন: ‘আমার সুমহান ইজ্জতের খাতিরে যারা পরম্পরের মধ্যে ভালোবাসা স্থাপন করেছে তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ এমন দিন, আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই।’ [মুসলিম]

রাসূল (সা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানো ঈমানের কোন বন্ধন সবচেয়ে শক্তিশালী? ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) ভালো জানেন। রাসূল (সা) বললেন, সবচেয়ে শক্তিশালী ঈমান হচ্ছে, আল্লাহর উদ্দেশ্য আনুগত্য করা, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা করা। [মুসতাদরাক-ই-হাকিম]

◆ যেসব কারণে দলের মধ্যে ঈমানের বন্ধন ক্ষতিগ্রস্ত হয়-

১. দাওয়ার প্রতি নিষ্ঠাহীনতা

২. নির্থক কথাবার্তা

৩. ক্রেত্ব

৪. দলীয় নেতৃত্ব ও পরিচালনায় দুর্বলতা

◆ দাওয়াকারী দলের কোনো সদস্য যদি তার নির্ধারিত কাজটি সঠিক গুরুত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন না করে তাহলে এতে অন্যরা বিরক্ত ও ক্ষুঁক্ষু হতে পারে। যদিও এই বিরক্তি ও ক্ষোভের প্রকাশ অবশ্যই সংযত হওয়া উচিত; কিন্তু মূলত এই বিরক্তি ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে কোনো সদস্যের নিষ্ঠাহীনতার কারণে। আল্লাহর দাওয়াত বহনকারীর জন্য নিষ্ঠাহীনতা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

◆ নির্থক কথাবার্তা বলা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ বলেন,

মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে যারা নিজেদের নামাযে বিনীত-ন্ম, যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্ণিষ্ট... [সূরা আল মুমিনুন: ১-৩]

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে যাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে অথচ সে ওই কথার অনিষ্টতা জানে না, কিন্তু ওই কথায় তাকে জাহানামের এতটা গভীরে নিক্ষেপ করে যতটা দূরত্ব রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। [বুখারী ও মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, কোনো বান্দা এমন একটি কথা উচ্চারণ করে, আর তা শুধু লোকজনকে হাসানোর উদ্দেশ্যেই বলে। এই কথার দরং সে (জাহানামের মধ্যে) এতটা দূরে নিষ্কিষ্ট হবে যতটা দূরত্ব রয়েছে আসমান ও জরিমনের মধ্যে। বন্ধুত্ব বান্দার পায়ের পিছলানো থেকে তার মুখের পিছলানো অধিক হয়ে থাকে। [বায়হাকী]

রাসূল (সা) বলেন, মানুষ যখন অনর্থক বিষয়গুলো ত্যাগ করে তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। [তিরমিয়ী, মুয়াত্তা, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মায়া ও বাযহাকী]

◆ ক্রোধ দাওয়াকারীদের মধ্যে ঈমানের বন্ধনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রাসূল (সা) বলেন, ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে নষ্ট করে যেভাবে মুসাবির মধুকে নষ্ট করে। [বাযহাকী]

অপর হাদীসে আছে, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে... ...। [আরু দাউদ]

◆ সদস্যদের দলকে নেতৃত্বদান ও পরিচালনার দুর্বলতা দলের ঈমানের বন্ধনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দলের মধ্যে অহেতুক উচ্চ-নিচু শ্রেণীভেদ প্রকাশ ঘটানো হয়। অথচ রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

◆ ঈমানের বন্ধন সুদৃঢ় রাখার উপায়:

১. নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা। দাওয়াত ছোট-বড় প্রত্যেকটি কাজকে রাসূল (সা)-এর দাফনকাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে।

২. অর্থহীন কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। দল থেকে বিতরণ করে দেয়া বই-নিবন্ধ-বক্তব্যগুলো ভালোভাবে পড়ে সেগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলে অর্থহীন কথা সুযোগ থাকবে না।

৩. ক্রোধকে শয়তানের বন্ধু ও নিজের শক্তি মনে করা। আল্লাহ বলেন,

তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা রাগকে হজম করে এবং মানুষের সঙ্গে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে চলে। আল্লাহ ও এ ধরনের মুহসীন তথা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। [সূরা আলে-ইমরান: ১৩৪]

হযরত আলী (রা)-এর উপদেশ, “অহক্ষারের প্রতি দুর্বলতা, ক্রোধ ও ঔদ্ধত্য প্রবণতার উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ কর।”

৪. নেতৃত্বের ব্যাপারে রাসূল (সা) ও সাহাবীগণের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দাওয়াকারীদের জন্য সর্বকালীন আদর্শ। সেধরনের নেতৃত্ব দলের মধ্যে ঈমানের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। দায়িত্বশীলদের উচিত ঘন ঘন কর্মাদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। রাসূল (সা) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর থেকে বের হয় তখন তার পেছনে সক্তর হাজার ফেরেশতা থাকে। তারা সবাই তার জন্য দোয়া করে এবং বলে, হে আমাদের রব, এই ব্যক্তি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য

(তার ভাইয়ের সঙ্গে) মিলিত হয়েছে। অতএব, তুমিও তাকে তোমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কর। [বায়হাকী]

◆ সুতরাং সর্বান্বকরণে ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই দাওয়ার সঙ্গে টিকে থাকার একমাত্র পথ। ইনশাআল্লাহ, আমরা তাদের অংশ হতে চাই যাদের সম্বন্ধে রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহতায়ালা বলেন, আমার মর্যাদার খাতিরে যারা পরম্পরের মধ্যে ভালোবাসা স্থাপন করে, তাদের জন্য (পরকালে) নূরের এমন সুউচ্চ মিনার হবে যে, তাদের জন্য নবী এবং শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। [তিরমিয়ি]

দাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয়

আল্লাহর প্রদত্ত রিজিক থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দায়িত্ব:

يَا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْعُضُ فِيهِ وَلَا
خُلْلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বস্তুত্ব। [সূরা বাকারাঃ: ২৫৪]

দাওয়ার ফরয আদায করার জন্য সাধ্যমতো সময ও অর্থ উভয়টিই ব্যয করতে হবে:

إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ هُمْ أَجْحَدُهُ

নিচয়ই আল্লাহ মুমিনদের জীবন ও সম্পদ জানাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। [সূরা তওবা: ১১১]

অধিকাংশ মুফাসিসের ভাষ্যমতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বায'আতে আকাবায অংশগ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। [মা'রেফুল কুরআন]

বায'আতে আকাবায অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ মদীনায ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল (সা)-কে আনুগত্যের শপথ দিয়েছিলেন। আজকের দিনেও তাঁদের মতো করে আমদেরকে নিজেদের জীবন ও সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয করতে হবে এবং এর বিনিময় অবশ্যই জান্নাত।

তরণ বয়সে দাওয়া করার প্রয়োজনীয়তা

রাসূল (সা) বলেছেন,

لَا تَنْزُولُ قَدْمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَادَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

কিয়ামতের দিন আদম সন্নানের পা দুটো তার রবের কাছ থেকে একটুও নড়তে পারবে না, যে পর্যন্ত না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে: (১) তার আযুষ্কাল সম্পর্কে – সে কী কাজে তা ক্ষয় করেছে? (২) তার যৌবনকাল সম্পর্কে – সে কীভাবে তা কাটিয়েছে? (৩) তার ধনসম্পদ সম্পর্কে – সে কোথা থেকে তা অর্জন করেছে? (৪) আর কোথায়

তা ব্যব করেছে? (৫) এবং যে বিদ্যা অর্জন করেছিল তা অনুযায়ী কী আমল করেছে?
[তিরমিয়ি]

অর্থাৎ আল্লাহ যৌবনকাল নিয়ে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তিরমিয়ির আরেক বর্ণনায়, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে যথাযথ মূল্য দিতে বলা হয়েছে। বুখারী-মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায়, (شَابٌ نَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ) তরুণ বয়সে আল্লাহর দাসত্বকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়াতলে আশ্রয় পাবে। সুতরাং এই তরুণ বয়স থেকেই দাওয়া শুরু করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যিক।